রাখী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

২৫ বৈশাখ ১৩৮৫

কানাই সামন্ত -কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত

প্রকাশক রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

খেয়া

গীতাঞ্জলি-গোষ্ঠী

গীতাঞ্জলি

গীতিমাল্য

গীতবিতান

স্ফুলিঙ্গ-গোষ্ঠী

মহুয়া

লেখন

যে যে কবিতা কোনো-না-কোনো অংশ বাদ দিয়া
গৃহীত, সূচীপত্রে সেগুলির উল্লেখ বিন্দু-চিহ্নিত।

গীতবিতান-গুচ্ছে কদাচিৎ কোনো গানের পূর্বপাঠ
গৃহীত, কেননা আবৃত্তি করা যায় সহজে।

উৎসর্গ-কবিতার আধার-গ্রন্থ পূরবী (শ্রাবণ ১৩৩২) ও
প্রবেশক-কবিতার— বৈকালী (আষাঢ় ১৩৮১)

চিত্রসূচী

চিত্র। শিল্পী

প্রচ্ছদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রপ্রতিকৃতি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রত্যাগত। নন্দলাল বসু

ছবি। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুষ্পচয়িনী। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

রবীন্দ্র-লেখাঙ্কন

প্রবেশক : দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা

বরণডালা : আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার

ছবি : একলা বসে হেরো তোমার ছবি

গান : বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে

গান : তোমার গোপন কথাটি সখী

ভূমিকা

বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক-জাতীয়, উদাসীন, গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী। আর, ভালোবাসাটা লৌকিক-জাতীয়, সাকারে জড়িত। একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করছে, আর-একজন অনন্তসুধা দান করছে। স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর-একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক। আর, যে সৌন্দর্যব্যাকুল সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ততৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ— যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে; এইজন্যে তারা যাকে-তাকে ভালোবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে; এইজন্যে জ্ঞান বলো, প্রেম বলো, কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচে না। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাকলেই ভালো হয়, কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না, সেই সামঞ্জস্য আছে; নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ REAL এবং পরিপূর্ণ IDEAL'এর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য। ২১ মে ১৮৯০ [৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭][১]

—রবীন্দ্রনাথ

রিয়েল ও আইডিয়েলের মিলনে যেমন কবিতা তেমনি প্রেমে-পরিণয়ে-সম্মিলিত যুগল নরনারীর জীবনযাত্রা, তরুণ রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি। যেমন কবিতা-রচনার তেমনি নূতন এক সংসার-সৃষ্টির প্রকৃতি ও পদ্ধতি বুঝি একই। মর্ত্য এবং স্বর্গ, বাস্তব এবং কল্পনা, স্থিতি ও গতি, প্রাণ ও মন, নারী ও পুরুষ, মুখোমুখি দুটি পক্ষে শ্রেণীবদ্ধ করে যদি দেখা যায় বিশ্বসৃষ্টির তাবৎ বিষয় ও বিষয়ীকে, যথার্থ জ্ঞানী ও অনুভবী জনের তবু কোনোটিতে নেই পক্ষপাত। তিনি জানেন দুটিতে মিলে যে সামঞ্জস্য, যে সমন্বয়, যে সংগতি ও সংগীত, সেটিই মানবজীবনের অন্বিষ্ট। এ কথাও সত্য, সৃষ্টির ভিতরে সব-কিছু স্বভাবতই মিশ্রিত, মিলিত; কিছুই অদ্বয় বিশুদ্ধ নয়। অতএব এক সমন্বয় থেকে আর-এক সমন্বয়ে উত্তরণ পথে পথে, পদে

পদে, ফিরে ফিরে, এই যেন মানবজীবনের লক্ষ্য ও লক্ষণ। এটুকু মনে রেখে এখন দেখা যাক নারী ও পুরুষকে এবং তাদের প্রেমময় মিলনকে কী দৃষ্টিতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, আমাদের দেখিয়েছেন।—

'আনন্দলহরী নামে একটি কাব্য শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত। তাতে যাঁর স্তব-গান আছে তিনি হচ্ছেন বিশ্বের মর্মগত নারীশক্তি। সেই শক্তি আনন্দ দেন। এক দিকে বিশ্বকে যেমন আমরা জানি, ব্যবহার করি, অন্য দিকে তেমনি বিশ্বের সঙ্গে আমাদের অহেতুক তৃপ্তির যোগ। বিশ্বকে আমরা জানি, তার কারণ, বিশ্বে সত্যের আবির্ভাব। বিশ্বে আমাদের তৃপ্তি, তার কারণ, বিশ্ব আনন্দের প্রকাশ। ঋষিরা বলেছেন, এই বিশ্বব্যাপী আনন্দেরই নানা মাত্রা জীব-সকল নানা উপলক্ষে ভোগ করে। কোহ্যেবাণ্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কারো প্রাণ-চেষ্টার উৎসাহমাত্র থাকত না যদি আকাশ পূর্ণ করে এই আনন্দ না থাকতেন। শেলি ***Intellectual Beauty*** নাম দিয়ে তাঁর কবিতায় যাঁর স্তব করেছেন, তাঁর সঙ্গে এই সর্বব্যাপী আনন্দের ঐক্য দেখি। এই বিশ্বগত আনন্দকেই আনন্দলহরীর কবি নারীভাবে দেখেছেন। অর্থাৎ, মানবসমাজে এই আনন্দশক্তির বিশেষ প্রকাশ নারী-প্রকৃতিতে। এই প্রকাশকে আমরা বলি মাধুর্য। মাধুর্য বলতে কেউ যেন লালিত্য না বোঝেন। তার সঙ্গে ধৈর্য-ত্যাগ-সংযম -যুক্ত চারিত্রবল আছে; সহজ বুদ্ধি, সহজ নৈপুণ্য, দরদ, চিন্তায় ব্যবহারে ভাবে ও ভঙ্গীতে শ্রী প্রভৃতি নানা গুণের মিশোল আছে। কিন্তু এর গূঢ় কেন্দ্রস্থলে আছে আনন্দ, যা আলোর মতো স্বভাবতই আপনাকে নিয়ত বিকীর্ণ (radiate) করে, দান করে।'[২]

'প্রেয়সীস্বরূপিণী নারীর এই আনন্দশক্তিকে পুরুষ লোভের দ্বারা আপন ব্যক্তিগত ভোগের পথেই আজ পর্যন্ত বহুল পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করেছে, বিকৃত করেছে, তাকে বিষয়সম্পত্তির মতো নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বদ্ধ করেছে। তাতে নারীও নিজের অন্তরে আপন যথার্থ শক্তির পূর্ণ গৌরব উপলব্ধি করতে বাধা পায়। সামান্য সীমার মধ্যে মনোরঞ্জনের লীলায় পদে পদে তার ব্যক্তিস্বরূপের মর্যাদাহানি ঘটেছে। তাই মানবসমাজের বৃহৎ ক্ষেত্রে নারী আপন প্রকৃত আসন পায় নি বলেই আজ সে আত্মমর্যাদার আশায় পৌরুষলাভের দুরাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত। অন্তঃপুরের প্রাচীর থেকে বাইরে চলে আসার দ্বারায় নারীর মুক্তি নয়। তার মুক্তি এমন একটি সমাজে যেখানে তার নারীশক্তি, তার

আনন্দশক্তি, আপন উচ্চতম প্রশস্ততম অধিকার লাভ করতে পারে।'[৩]

সে সমাজ হয়তো আজও কোথাও আকার পায় নি। সর্বাঙ্গসুন্দর করে আকার দিতে হবে, আজকের প্রবুদ্ধ মানুষের আর ভাবী কালের তরুণ-তরুণীর এই দায়।—

'নারীর দুইটি রূপ— একটি মাতৃরূপ, অন্যটি প্রেয়সীরূপ। মাতৃরূপে নারীর একটি সাধনা আছে; এই সাধনায় সন্তানের নয়, সুসন্তানের সৃষ্টি। সেই সুসন্তান সংখ্যাপূরণ করে না, মানবসংসারে পাপকে অভাব-অপূর্ণতাকে জয় করে। প্রেয়সীরূপে তার সাধনায় পুরুষের সর্বপ্রকার উৎকর্ষচেষ্টাকে প্রাণবান করে তোলে। যে গুণের দ্বারা তা সিদ্ধ হয় পূর্বেই বলেছি সে হচ্ছে মাধুর্য।'[৩]

এই সময় ভারতবর্ষীয় বিবাহের ঐতিহ্য আলোচনায় কালিদাসের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—

'সমাজনীতি-রক্ষার উদ্দেশে ভারতবর্ষের বিবাহ যে সৌজাত্যের প্রতি লক্ষ করত তার সম্বন্ধে কবির বিশেষ বেদনা ছিল সন্দেহ নেই। অথচ বিশ্বের লীলাময়ী প্রাণপ্রকৃতির মাঝখানে নরনারীর স্বাভাবিক প্রেমচাঞ্চল্যের সৌন্দর্যবিকাশও কবির চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। ভরতবংশের জন্ম ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটনা, অথচ এই বংশের আদিতে প্রবৃত্তির আকর্ষণে স্ত্রীপুরুষের যে আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল, কবি তাঁর নাটকে তার বৃত্তান্তকে সৌন্দর্যদৃষ্টিতে স্বীকার ক'রেও অবশেষে কল্যাণ-দৃষ্টিতে শোধন করে নিয়েছিলেন। তপোবনে অরণ্যের সহজ শোভার মধ্যে শকুন্তলা সেখানকার তরুলতার সঙ্গে সঙ্গেই নবযৌবনে দেহে মনে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে। সেখানে প্রকৃতির ইঙ্গিত সব জায়গাতেই; সমাজশাসন এখনো তার তর্জনী তোলবার অবকাশ পায় নি। এই অবস্থায় দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার যে মিলন ঘটেছিল, সমস্ত সমাজের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘটতে পায় নি। সেই কারণে এর মধ্যে একটা অভিশাপ রয়ে গেল। শকুন্তলা আতিথ্যধর্ম পালন করতে ভুলে গেলেন। এইখানে জৈবধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধ বাধল। রাজসভায় শকুন্তলার প্রেমের উপর অপমানের বজ্র এসে পড়ল। সপ্তমাঙ্কে যে তপোবনে রাজার সঙ্গে তপস্বীকন্যার স্থায়ী মিলন ঘটল, সেখানে প্রকৃতির প্রাণলীলাকে আচ্ছন্ন করে কবি তপস্যার কঠোর মূর্তিকেই প্রকাশ করলেন। শকুন্তলা সেখানে ব্রতধারিণী জননী-মূর্তিতে দেখা দিলেন। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, নরনারীর মিলনের দুই বিরুদ্ধ

মূর্তিকে কবি এই নাটকে উজ্জ্বল করে দেখিয়েছেন।'[৪]

প্রকারান্তরে চিত্রাঙ্গদা[৫] দৃশ্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাই কি করেন নি? অবশ্য, সমাজপ্রতিভূ-স্বরূপ কোনো দুর্বাসা-নিক্ষিপ্ত কোনো অভিশাপবজ্রের প্রয়োজন এখানে হয় নি। কেননা, যে চিত্রাঙ্গদা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, মহাকবি ব্যাসের নয়, তিনি সজ্ঞানে সচেতনভাবে চিরবাঞ্ছিত দয়িতকে অপরূপ সৌন্দর্য ও প্রেম -মোহপাশে আবদ্ধ ক'রে, পরিণামে আপনার সেই মোহমায়া আপনি সংবরণ করে তাঁকে এ কথাই বলেছেন :

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি।...
গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে—
তখন জানিবে মোরে প্রিয়তম!

কুলোজ্জ্বল কুমার-সম্ভবের প্রতিশ্রুতিতেই সৌন্দর্যময় বিচিত্র-সুখদুঃখ-তরঙ্গিত উদ্‌বেল প্রেমলীলার যথার্থ শমে পৌঁছনো গেল। অর্জুনও অনুভব করলেন: আজ ধন্য আমি! অর্থাৎ, অলৌকিক মোহ এবং মোহমুক্তি উদার উন্মুক্ত বিশ্বের আলো-ময় কর্মক্ষেত্রে, দু'ই অতিশয় সুন্দর ক'রে দেখালেন আমাদের কবি।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে অন্যত্র বলে থাকবেন তিনি, পুরুষের নয় প্রেমের অভিসার, নারীই যথার্থ অভিসারিকা। কন্যা স্বভাবতই স্বয়ংবরা। সজনে নির্জনে অথবা মনে মনে যখনই বরকে বরণ করে নেন বধূ, স্বর্গলোকে জেগে ওঠে আমাদের অশ্রুত হুলুরব আর অনাহত শঙ্খধ্বনি। হৈমবতী সাবিত্রী রুক্মিণী দময়ন্তীকে স্মরণ করলেই এ কথা প্রমাণিত হয় না কি? আর, রবীন্দ্র-কল্পনার বিভিন্ন পরাকাষ্ঠা-রূপিণী দেবযানী চিত্রাঙ্গদা, কমলা বিনোদিনী, ললিতা দামিনী,

অপর্ণা নন্দিনী, প্রকৃতি শ্যামা সুদর্শনা, এঁরাও৬ অনুকূল সাক্ষ্য দেন নানাভাবে— প্রেমের আনন্দময় পরিপূর্তিতে নাই-বা পৌঁছলেন প্রত্যেকে। পুরাণে দেখি, অবলীলায় অশ্বরশ্মি ধারণ করেন সুভদ্রা তাঁর স্বয়ংবৃত পতির সারথ্যে; অর্জুনের রথখানি চালনা করেন পশ্চাদ্‌ধাবিত যাদব যোদ্ধগণের ব্যূহরচনার চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে। এর কি নেই কোনো প্রতীকী তাৎপর্য? বলা যেতে পারে, কথাপ্রসঙ্গে শকুন্তলাকে দেখে সর্বাগ্রে আকৃষ্ট হয়েছিলেন দুষ্মন্ত। সে কথা আংশিক সত্য হলেও, তরুণী-রূপের সেই-যে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তার উদ্ভব কোথা থেকে? নিমিত্তকারণ কে? উৎফুল্ল বসন্তবনভূমির মতোই পরিপূর্ণ যৌবনের রূপে রসে ও সংরাগে শিহরিত পুলকিত উচ্চকিত শকুন্তলা, আপনি না জেনেও, অনায়াসে আকর্ষণ করেছিলেন ব'লেই তো আকৃষ্ট হন দুষ্মন্ত। অনুকূল লগ্নে যে সৌন্দর্য-প্রতিমা, প্রেম-প্রতিমা, এসে পড়ে দৃষ্টিপথে অথবা সামনে দিয়ে চলেও যায়, অতর্কিত অভাবিত তার ক্রিয়া শুরু হয় তখনই— চোখে চোখে মিলনের অপেক্ষাই থাকে না।

চিন্তনীয় হলেও, বিষয়টির বিস্তারের প্রয়োজন এখানে নেই। এ দেশে সাংখ্যে তন্ত্রে, পুরাণে চণ্ডীতে, আউল বাউলের গানে আর বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে নারীকে শক্তি বলা হয়েছে, পরাশক্তির প্রতিনিধি, এ কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন এবং ঐ শক্তির প্রকৃতি-নির্ণয়ে কখনো তাকে বলেছেন 'হ্লাদিনী', কখনো 'মাধুর্য'। মাধুর্য কেবল লালিত্য নয়। বর্তমান প্রসঙ্গটি আর-একটু বিশদ করতে হলে রবীন্দ্র-রচনা থেকেই আরো-কিছু চয়ন করা দরকার; ভাবের ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায়, ভাষার লাবণ্যে, তা আমাদের স্বতই বিমুগ্ধ অথচ সচেতন ক'রে তোলে।—

'নারীর প্রেমে পুরুষের কেবল যে আনন্দ তা নয়, তার কল্যাণ। লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে। লক্ষ্মীতে সৌন্দর্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ। সৃষ্টিতে যতক্ষণ দ্বিধা থাকে, ততক্ষণ সুন্দর দেখা দেয় না। সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই সুন্দরের আবির্ভাব।

'নারীপ্রকৃতি আপনার স্থিতিতে প্রতিষ্ঠ। সার্থকতার সন্ধানে তাকে দুর্গম পথে ছুটতে হয় না। জীবপ্রকৃতির একটা বিশেষ অভিপ্রায় তার মধ্যে চরম

পরিণতি পেয়েছে। সে জীবধাত্রী, জীবপালিনী, তার সম্বন্ধে প্রকৃতির কোনো দ্বিধা নেই। প্রাণসৃষ্টি প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার দেহে মনে পর্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি-বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, পুরুষ মুক্ত। চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে আমরা যাকে সভ্যতা বলি সে হল প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি।

'গতিবেগমত্ত পুরুষের চলমান সৃষ্টি সর্বদাই স্থিতির একটা মূল সুরকে কানে রাখতে চায়; পুরুষের শক্তি তার অসমাপ্ত সাধনার ভার বহন করে চলবার সময় সুন্দরের প্রবর্তনার অপেক্ষা রাখে। সেই স্থিতির ফুলই হচ্ছে নারীর মাধুর্য, সেই স্থিতির ফলই হচ্ছে নারীর মাঙ্গল্য, সেই স্থিতির সুরই হচ্ছে নারীর শ্রী সৌন্দর্য, নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে।[৭]

'পুরুষের সংসারে কেবলই চিন্তার দ্বন্দ্ব, সংশয়ের দোলা, তর্কের সংঘাত, ভাঙাগড়ার আবর্তন— এই নিরন্তর প্রয়াসে তার ক্ষুব্ধ দোলায়িত চিত্ত প্রাণলোকের সরল পরিপূর্ণতার জন্যে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে থাকে। মেয়েদের মধ্যে সেই প্রাণের লীলা। এই সুসমাপ্তির সৌন্দর্য, এই প্রাণের সহজ বিকাশ পুরুষের মনে কেবল যে তৃপ্তি আনে তা নয়, তাকে বল দেয়, তার সৃষ্টিকে অভাবনীয় রূপে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে থাকে। আমাদের দেশে এইজন্যে পুরুষের সাধনায় মেয়েকে শক্তি বলে স্বীকার করে। ফুলকে দেখি প্রত্যক্ষ কিন্তু যে গূঢ় শক্তিতে সেই ফুল ফোটায় তাকে কোথাও ধরা-ছোঁওয়া যায় না। পুরুষের কীর্তিতে মেয়ের শক্তি তেমনি নিগূঢ়।[৮]

'স্থিতি যে পেয়েছে বসে বসে ক্রমে ক্রমে চারি দিকের সঙ্গে আপন সম্বন্ধকে সে সত্য করতে পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। সম্বন্ধ সত্য হলে মুক্তি পাওয়া যায়। সে মুক্তি বাইরের সমস্ত দুঃখ অভাবের উপর জয়ী হয়। এইজন্যেই মেয়ের জীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সার্থকতা হচ্ছে প্রেম। এই প্রেমে সে স্থিতির বন্ধনরূপ ঘুচিয়ে দেয়। মুক্তি না হলে কর্ম হতে পারে কিন্তু সৃষ্টি হতে পারে না। মেয়েকেও সৃষ্টি করতে হবে, তার পক্ষে এই সৃষ্টি প্রেমের দ্বারাই সম্ভব।

'প্রেমের সৃষ্টিক্ষেত্র নিঃসঙ্গ নির্জনে হতেই পারে না, সে ক্ষেত্র সংসারে। তার সৃষ্টিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্য; ব্যক্তিবিশেষের তুচ্ছতাও প্রেমের কাছে মূল্যবান। নারীর প্রেম যে পুরুষকে চায় তাকে প্রত্যক্ষ চায়, তাকে নিরন্তর নানা আকারে বেষ্টন করবার জন্যে সে ব্যাকুল। ব্যক্তিবিশেষ জিনিসটি অত্যন্ত বাস্তব। তাকে পেতে গেলে তার সমস্ত তুচ্ছ খুঁটিনাটির কোনোটাকে বাদ দেওয়া চলে না; তার দোষত্রুটিকেও মেনে নিতে হয়। অভাবকে অসম্পূর্ণতাকে প্রেম কামনা করে; নইলে তার নিজের সম্পূর্ণতা সফল হবে কিসে?

'মেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম, তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালোবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। মেয়েদের মধ্যেও পুরুষের কল্পনা আপন মুক্তি পায়। নারীর চারি দিকে যে পরিমণ্ডল আছে তা অনির্বচনীয়তার ব্যঞ্জনা দিয়ে তৈরি; পুরুষের কল্পনা সেখানে আপনার রসের রঙ আপনার ভাবের রূপ মিলিয়ে দিতে কঠিন বাধা পায় না।

'পুরুষের পক্ষে মেয়ে আপনার সঙ্গে-সঙ্গেই একটা দূরত্ব নিয়ে আসে; তার মধ্যে খানিকটা পরিমাণে নিষেধ আছে, ঢাকা আছে। বিয়াত্রিচে দান্তের কল্পনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বস্তুত একটি অসীম বিরহ। দান্তের হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দূর আকাশে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীর হয়তো বাইরের বিচ্ছেদ ছিল না, কিন্তু কবি যেখানে তাকে ডেকে বলছে—

> তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরনী,
>
> তুমি সে নয়নের তারা

সেখানে রজকিনী রামী কোন্ দূরে চলে গেছে তার ঠিক নেই। হোক-না সে নয়নের তারা, তবুও যে নারী বেদবাদিনী, হরের ঘরনী, সে আছে বিরহলোকে। সেখানে তার সঙ্গ নেই, ভাব আছে। নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।'[৯]

প্রসঙ্গের শেষ নেই, অথচ উৎকলনের লোভ এখানেই সংবরণ করতে হল। রাখী-সংকলনের ভার দিয়ে বর্তমান সম্পাদককে অনুরোধ করা হয় একটি ভূমিকা লিখে দিতে। সে অনুরোধ কিভাবে কতটা পালন করা গেল সুধীজন অবশ্যই বুঝবেন আর বুদ্ধিমতী পাঠিকার স্মিত কৌতুকেই সম্পাদকের যথেষ্ট পুরস্কার হবে। এ তো স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ অথবা কবিতা গানের সংকলন সর্ব-সমক্ষে ধরে দিতে হলে, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর-কারোই নান্দীপাঠের প্রয়োজন হয় না। অতএব যাঁর কাজ তিনিই তা উদ্‌যাপন করলেন। সম্পাদক উপলক্ষ-মাত্র। সংকলনের নানা অংশ নিয়ে অথবা সামগ্রিক আলোচনায় কবির 'স্বয়ংভাষ্য' প্রচুর উদ্ধার করা যায় না এমন নয়। কিন্তু তারও স্থান অথবা প্রয়োজন নেই। রসোত্তীর্ণ কবিতা গান নিজগুণেই স্বপ্রকাশ। বেশি ক'রে তার ব্যাখ্যার চেষ্টা অনেক সময়েই রসগ্রাহিতার পেটুকতামাত্র অথবা কমলে কহ্লারে রঙের তুলি বুলোনো। বৈষ্ণবেরা যে 'রসচর্বণা'র উল্লেখ করেন, আমরা তার অর্থ বুঝি নে আর এ কালের তরুণ-তরুণীরও রুচিকর হবে না।

বর্তমান সংকলন সম্পর্কে কিছু বাড়তি কথা (বাহুল্য হয়তো নয়) এখানে বলতে হয়—

মহুয়া কাব্য[১০] রচনার পূর্বেই 'রাখী' বা 'বরণডালা' নামকরণে যে বিশেষ সংকলনের সংকল্প গ্রহণ করা হয় অথচ কবির আগ্রহ ও অভিনিবেশের অভাবে কাজ কিছু এগোয় না —উক্ত সংকল্পের অভিঘাতে নূতন-সৃজ্যমান মহুয়াই তাঁর মন অধিকার করে থাকে— বর্তমান কাব্যসংকলন তারই বহুবিলম্বিত পরিণাম।

অনিচ্ছায় বহু গান কবিতা আমাদের বর্জন করতে হয়েছে। জনে জনে রুচির বৈচিত্র্য আছে। অতএব যা সংকলন করা গেল তা সর্বাংশে সকলের মনোরঞ্জন হয়তো করবে না। তবু উজ্জ্বলে-মধুরে করুণে-সুন্দরে মিলিয়ে রূপভাবুক ও প্রেমপূর্ণ রবীন্দ্র-চিত্তের একটি সামগ্রিক রূপরেখা যদি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এ থেকে, তা হলেই এ প্রযত্ন সার্থক বলতে হবে। কবিচিত্ত আমাদেরই গূঢ় হৃদয়ের স্বচ্ছ ও সুন্দর দর্পণ।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান নয়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন। দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা, এ কথাও সত্য। অতএব প্রেম-পূজার অচল কঠিন দ্বৈতবাদ রবীন্দ্রকাব্যে অনাহূত, রসিক এ কথা বুঝবেন। বিশ্বসৃষ্টিতে, মানবজীবনে,

তরুণ-তরুণীর প্রাণ মন হৃদয়ের আবেশে আবেগে আন্দোলনে যা-কিছু সুন্দর মধুর এবং স্বভাবতই চমৎকারজনক ও মহান্— সবেরই বাণী ও ব্যঞ্জনা ব্যাপ্ত হয়ে আছে এই সঞ্চয়নে এটুকু আশা করা যায়।

কাব্যগ্রন্থ (১৩১০), চয়নিকা (১৩১৬), সঞ্চয়িতা (১৩৩৮), গীতবিতান (১৩৪৮), বিচিত্রা (১৩৬৮), সর্বত্র যেমন বহু রবীন্দ্র-রচনার অংশবিশেষ বর্জিত, বর্তমান সংকলনের প্রকৃতি ও পরিমিতি মনে রেখে এখানেও সেই রীতিরই অনুসরণ। এ ভাবে সংক্ষিপ্ত বা সংহৃত আকারে যে-যে কবিতার সংকলন, সূচীপত্রে সেগুলির উল্লেখ বিন্দুচিহ্নিত।

কবিতা গানের সন্নিবেশ প্রধানতঃ রচনার কালক্রমে কিন্তু প্রসঙ্গানুরোধে বা ভাবসাদৃশ্যে কোথাও কোথাও তার ব্যতিক্রম।

রাখীর গান-সংকলনই সব চেয়ে দুরূহ মনে হয়েছিল। কেবল কবিতা হিসাবে বিচার করলেও সে দুরূহতার লাঘব হয় না। এ ব্যাপারে শান্তিনিকেতনে-বাস-কালে অজস্র গান শুনিয়ে সহযোগিতা করেছেন যিনি জেনে বা না-জেনে, বিশ্ব-ভারতীর তিনি পুরাতন ছাত্রী, রবীন্দ্রসংগীতের গবেষিকা এবং বর্তমানে ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তাঁর উদ্দেশে সম্পাদকের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বিশ্বভারতীর কাছে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কাছে, সম্পাদক চিরকৃতজ্ঞ। কেননা, দীর্ঘকাল ধরে নানা দিক দিয়ে রবীন্দ্র-চর্চার যে অকুণ্ঠ আর নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ তাঁরা দিয়েছেন, বাঞ্ছিত ব'লেই তা দুর্লভ হতে পারত। আর, আজ যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আশাতীত সম্মানও বলা চলে, আমার সাধ্যমত তা উদ্‌যাপন করা গেল।

রবীন্দ্রকাব্যের এই অনুপম মাঙ্গল্য অঞ্জলি পেতে সাদরে গ্রহণ করুন বর্তমানের ও ভাবী কালের নব নব দম্পতি, অনুরাগ-রাখী বেঁধে দিন পরস্পরের মণিবন্ধে।

দোল-পূর্ণিমা ১৩৮৪

কানাই সামন্ত

দ্রষ্টব্য

১ চিঠিপত্র-৫ (১৩৫২), প্রমথ চৌধুরীর উদ্দেশে পত্র ১

৩ আনন্দলহরী, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩২

৪ ভারতবর্ষীয় বিবাহ, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩২

৯ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি (১৩৬৮), পৃ. ২৩। ছ. ২ - পৃ. ৩৯। ছ.৯
তা^{0} ২৮-২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪। অপিচ ২ অক্টোবরের লিখন দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অক্ষুণ্ণ রেখে মূল-রচনার অন্তর্বর্তী কোনো কোনো অংশ বাদ দিলেও, কোনো চিহ্ন দেওয়া হয় নি। প্রচলিত রীতির বিচারে বহু স্থলে বানান ও বিরামচিহ্নের বদল হয়েছে।

মন্তব্য

২ যা আলো তাই তেজ, পরম সূক্ষ্ম ও পরম অনির্বচনীয় সেই বস্তু সর্বব্যাপী হয়ে এ বিশ্বের সমস্ত শক্তির উৎস, এ কথা হয়তো আধুনিক বিজ্ঞানেও বলা হয়।

৫ 'সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতা' প্রবন্ধে (দ্রষ্টব্য : বিপিনচন্দ্র পালের 'সাহিত্য ও সাধনা', ১ম খণ্ড, ১৯৫৯ খৃস্টাব্দ) মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' 'উর্বশী' ও 'চিত্রাঙ্গদা' সম্পর্কে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন, তা আজও আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য :

'পতিতা' লোকচক্ষে 'পতিতা', সমাজে পরিত্যক্তা··· হইলেও, ভাগবতী প্রকৃতির বিগ্রহ বলিয়া, প্রকৃতপক্ষে সে দেবতা, তার এই দেবভাব ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত··· অন্তর্নিহিত দেবতা সেই পতিতার মধ্যেই আত্মস্বরূপের প্রকাশ করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন—এ বিশ্বাস কেবল হিন্দুর আছে।··· রবীন্দ্রনাথ হিন্দু না হইলে, 'পতিতা'র অপূর্ব আধ্যাত্মিক রূপরাশিকে এমনভাবে ··· কখনো ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেন না।

···'উর্ব্বশী' রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। জগতের আর কোনো সাহিত্যে 'উর্ব্বশী'র মত কোন কিছু আছে কি না সন্দেহ।··· এখানে অন্য-কামনা-শূন্য কাম, সর্ব্বসম্পর্কবিহীনা কামিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার ধ্যান করিতেছে। এখানে রমণী শুদ্ধ রমণীরূপে আপনার নিত্য ও নিজস্ব স্বরূপটীতে

…পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত।… রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' শ্রেষ্ঠতম কাব্য ও গভীরতম দর্শন। [পৃ. ১০৭-১০৯

রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী, চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি কাব্যজগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যত পড়ি, ততই যেন তার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য, সত্য ও সৌন্দর্য্য চিত্তকে উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। [পৃ. ১১৯

৬ আখ্যান কবিতা ও নানা শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য থেকে সকলেরই নামোল্লেখ অবশ্য হয় নি ; প্রত্যাশিত পারম্পর্যও নেই।

৭ প্রাণপ্রকৃতি অবদমিত হলে বা ক্রীতদাসী মাত্র হয়ে থাকলে, সর্বনাশা এই পরিণাম। এরই নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীতে।

৮ 'মানব-সভ্যতার সৃষ্টি করে তোলা মুখ্যভাবে পুরুষের দ্বারা ঘটেছে। এই সৃষ্টি কার্যে মেয়েদের ব্যক্তিরূপের যে প্রভাব সে হচ্ছে চিত্তকে গৌণ ভাবে সক্রিয় ক'রে তোলা।… অর্থাৎ জৈব-সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান, মানস-সৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের।' ৪ এপ্রিল ১৯২৬। রবীন্দ্র-উক্তির অনুলেখন, পরিমার্জনা তাঁরই। দ্রষ্টব্য শ্রীদিলীপকুমার রায়-প্রণীত তীর্থঙ্কর (১৩৪৬), পৃ. ১৭৩/ এ আলাপ-আলোচনার অন্যান্য অংশও দ্রষ্টব্য।

১০ রচনা মুখ্যতঃ ১৩৩৫ শ্রাবণ-পৌষে। প্রকাশ ১৩৩৬ আশ্বিনে। দ্রষ্টব্য মহুয়ায় রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সূচনা'।

রাখীর একটি উৎসর্গ পত্র রচনা করতে কবি ভোলেন নি। দুঃখের বিষয় মুক্তাপংক্তির মতো অক্ষরমালা-সাজানো তাঁর আপন হাতের লেখাটি বুঝি এতদিনে খোওয়া গেছে। তবু, সকল কালের রসিককে ও তরুণ-তরুণীকে লক্ষ্য ক'রে আর একজনকেই সম্বোধন ক'রে অলক্ষ্য লোকে সুধাস্রাবী কণ্ঠস্বরে তাঁর যে বাণী আজও ধ্বনিত, অন্তঃকর্ণে শুনে নিতে বাধা নেই। কবিকে স্মরণ না ক'রে এ কাব্য গ্রহণ করবে কে!—

ক্ষমা কোরো যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি — মোর কাব্যখানি লয়ে করে,
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী,
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা।
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে—
হয়তো ভাবিছ, 'যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।'
হয়তো বলিছ মনে, 'সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।'

২০ কার্তিক ১৩৩১

দোলে প্রেমের দোলন চাঁপা
হৃদয় আকাশে।
দোল-ফাগুনের চাঁদের আলোয়
সুধায় মাখা সে।।
কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে
বচনহারা ধ্যানের পারে
কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে
ছিল ঢাকা সে।।

দখিন হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল
গোপন রেণুকা।
গন্ধে তারি ছন্দে মাতে
কবির বেণুকা।
কোমল প্রাণের পাতে পাতে
লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে,
আমার গানের সুরে সুরে
রইল আঁকা সে।।

বাঁশিতে ডেকেছে কে

মরি লো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলেম ঘরে রব,
কোথাও যাব না—
ওই-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি,
বলো কী করি!
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে
যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশি
ধীর সমীরে—
ওগো, তোরা জানিস যদি
আমায় পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি 'তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে'।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

সারাবেলা

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন-সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল
রেখে যায় এই নয়ন-কোণে।

কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে।

সারা দিন গাঁথি গান
কারে চাহে গাহে প্রাণ,
তরুতলের ছায়ার মতো
বসে আছি ফুলবনে।

আকাঙ্ক্ষা

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়!
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে,
বিহগ বিহগী কী যে গায়!

আজি   মধুর বাতাসে   হৃদয় উদাসে,
রহে না আবাসে মন হায়।
কোন্   কুসুমের আশে   কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।

আজি   কে যেন গো নাই,   এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো—
তাই   চারি দিকে চায়,   মন কেঁদে গায়
'এ নহে, এ নহে, নয় গো'।
কোন্   স্বপনের দেশে   আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়—
আজি   কোন্ উপবনে,   বিরহবেদনে
আমারই কারণে কেঁদে যায়।

আমি   যদি গাঁথি গান   অথিরপরান,
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি   যদি গাঁথি মালা   লয়ে ফুলডালা,
কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি   আমার এ প্রাণ   যদি করি দান,
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা   ভয় হয় মনে   পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়।

স্মৃতি

ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে—
জন্ম-জন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।
যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ—
অনন্ত কালের মোর সুখ দুঃখ শোক,
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক!
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ—
সেই হাসি, সেই অশ্রু, সেই-সব কথা
মধুর মুরতি ধরি দেখা দিল আজ।
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন।

চুম্বন

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধরসঙ্গমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে,
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।

প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন—
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

দেহের মিলন

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ-তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ-'পরে।
তোমার নয়ন-পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।
তৃষিত পরান আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে,
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন—
সর্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্য-মাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহ মন চিররাত্রিদিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

বন্দী

দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ।
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস—

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
কোথায় উষার আলো, কোথায় আকাশ!
এ চিরপূর্ণিমারাত্রি হোক অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ—
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্য-পানে দেখি মুখ তুলি—
শুধু অবিশ্রামহাসি একখানি চাঁদ।
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়।

পবিত্র জীবন

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন—
মিছে এই দরশের পরশের খেলা!
চেয়ে দেখো, পবিত্র এ মানবজীবন—
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা!
ভেসে ভেসে এই মহা-চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্‌খান হতে—
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে!
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ—
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী।
নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস—
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি।
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি।

নিষ্ফল কামনা

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার, আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়বিষাদশ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি-মাঝে।
খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষাপারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে,
হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বদনব্যাপী

করুণ শান্তির তলে,
তোমারে কোথায় পাব—
তাই এ ক্রন্দন।

বৃথা এ ক্রন্দন।
হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস তাই ভালো—
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কী দুঃসাহস!
কী আছে বা তোর,
কী পারিবি দিতে!
আছে কি অনন্ত প্রেম?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরই মাঝে পথ করি
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চিরসহচরে
চিররাত্রিদিন
একা অসহায়?

যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন-তরে !

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার !
অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,
শত ঋতু-আবর্তনে,
বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখো তার সৌন্দর্যবিকাশ,
মধু তার করো তুমি পান,
ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে—
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই।

১৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৪

সুরদাসের প্রার্থনা

ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন, আমি কবি সুরদাস।
দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে, পুরাতে হইবে আশ।
অতি অসহন বহ্নিদহন
মর্ম-মাঝারে করি যে বহন,
কলঙ্করাহু প্রতি পলে পলে জীবন করিছে গ্রাস।

তোমারে কহিব লজ্জাকাহিনী, লজ্জা নাহিকো তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়।
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি আমা-পানে চাও,
খুলে দাও মুখ, আনন্দময়ী— আবরণে নাহি কাজ।
নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতিদূর—
উজ্জ্বল যেন দেবরোষানল, উদ্যত যেন বাজ।

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি তোমারে দেখেছি চেয়ে?
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা ওই মুখপানে ধেয়ে।
তুমি কি তখন পেরেছ জানিতে?
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে নিশ্বাসরেখাছায়া—
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা আকাশ-উষার কায়া?
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মতো রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায় লুব্ধ নয়ন হতে?

মোহচঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরন ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্ গুন্ কেঁদে তোমার দৃষ্টিপথে ?

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম।
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই, ফুটেছে মর্মতলে—
নির্বাণহীন অঙ্গারসম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ—
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক।

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধমুরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরন সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূর দিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনককিরণ-জ্বালা,
চকিততড়িৎ সঘন বরষা, পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরৎ-আকাশে অসীমবিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু—
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও, মাগিতেছি অকপটে
তিমিরতুলিকা দাও বুলাইয়া আকাশচিত্রপটে।

ইহারা আমারে ভুলায় সতত, কোথা নিয়ে যায় টেনে!
মাধুরীমদিরা পান করে শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে।
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায় আমার বাঁশরি কাড়ি—
পাগলের মতো রচি নব গান, নব নব তান ছাড়ি।
আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া আপনি অবশ মন—
ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ বসন্তসমীরণ।

আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ সর্বশরীরে পশে।
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।
শ্লথ হয়ে আসে হৃদয়তন্ত্রী, বীণা খসে যায় পড়ি—
নাহি বাজে আর হরিনামগান বরষ বরষ ধরি।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে—
বাড়ে তৃষা, কোথা পিপাসার জল অকূল লবণনীরে!
গিয়েছিল, দেবী, সেই ঘোর তৃষা তোমার রূপের ধারে—
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা লোপ করো একেবারে।

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি পশেছে জীবনমূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মুরতিখানি কেটে কেটে লও তুলে।
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে নিখিলের শোভা যত—
লক্ষ্মী যাবেন, তাঁরি সাথে যাবে জগৎ ছায়ার মতো।

ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ মধুর মূর্তি, স্নিগ্ধ আনত আঁখি!
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে দেবীর প্রতিমা-সম—
স্থিরগম্ভীর করুণ নয়নে চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যাকিরণ পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড়তিমির কেশে—
শান্তিরূপিণী এ মুরতি তব অতি অপূর্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে অনন্তনিশি-মাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যাশোভা তোমারে ঘিরিয়া চিরকাল জেগে রবে।
এই বাতায়ন, ওই চাঁপা গাছ, দূর সরযূর রেখা—
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে চিরদিন যাবে দেখা।

সে নব জগতে কালস্রোত নাই, পরিবর্তন নাহি—
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে চিরদিন রবে চাহি।

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ— দেবী, তাহে কিবা ক্ষতি,
হৃদয়-আকাশে থাক্-না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।

২২-২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫

ধ্যান

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি—
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি।

তোমার পাই নে কূল,
আপন-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই নে তুল।
উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত
একটি নয়ন-সম—

অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি
নাহিকো তাহার সীমা।

তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন—
আমি অশান্ত, বিরামবিহীন,
চঞ্চল অনিবার—
যত দূর হেরি দিক্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

২৬ শ্রাবণ ১২৯৬

পূর্বকালে

প্রাণমন দিয়ে ভালোবাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক—
তবু তুমি ভবে চিরগৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার?
তোমা ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারি নে ভালো কি বাসিতে পারে।

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভালো তো বেসেছে তারা—

আমি তত দিন কোথা ছিনু দল-ছাড়া ?
ছিনু বুঝি বসে কোন্ এক পাশে
পথপাদপের ছায়
সৃষ্টিকালের প্রত্যূষ হতে
তোমারি প্রতীক্ষায়—
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায় !

অনাদি বিরহবেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ।
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।

২ ভাদ্র ১২৯৬

অনন্ত প্রেম

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শত বার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার—
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতিপুরাতন বিরহমিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমিররজনী ভেদিয়া
তোমারি মূরতি এসে
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়নসলিলে
মিলনমধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,
নিখিলপ্রাণের প্রীতি—
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি
সকল কালের সকল কবির গীতি।

২ ভাদ্র ১২৯৬

নিদ্রিতা

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া ;
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার,
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।
শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্বতটে হতেছে নিশি ভোর ;
আকাশকোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙে নি ঘুমঘোর।
সমুখে প'ড়ে দীর্ঘ রাজপথ,
দু ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার ;
নয়ন মেলি সুদূরপানে চেয়ে
আপনমনে ভাবিনু একবার—
আমারি মতো আজি এ নিশিশেষে
ধরার মাঝে নূতন কোন্ দেশে
দুগ্ধফেনশয়ন করি আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি তখনি বাহিরিনু,
কত যে দেশ বিদেশ হনু পার ;
একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী ;
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।

ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে।
প্রাসাদমাঝে পশিনু সাবধানে,
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রানীমাতা,
কুমার-সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা ;
একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুলবিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা ;
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে,
বাজিল বুকে সুখের মতো ব্যথা।
মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে ;
একটি বাহু বক্ষ'পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি ;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি।
দেখিনু তারে, উপমা নাহি জানি—
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভরা লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিনু দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয়কম্পন ;

ভূতলে বসি আনত করি শির
মুদিত আঁখি করিনু চুম্বন।
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি
তাহারি পানে চাহিনু এক মনে ;
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে।
ভূর্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিনু আপন নাম ধাম ;
লিখিনু, 'অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।'
যতন করি কনকসুতে গাঁথি
রতনহারে বাঁধিয়া দিনু পাঁতি ;
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা
তাহারি গলে পরায়ে দিনু মালা।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সুপ্তোত্থিতা

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম, উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখি, কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া, হস্তীশালে হাতি।
মল্লশালে মল্ল জাগি ফুলায় পুন ছাতি।
জাগিল পথে প্রহরীদল, দুয়ারে জাগে দ্বারী।
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা জাগিয়া নরনারী।
উঠিল জাগি রাজাধিরাজ, জাগিল রানীমাতা।
কচালি আঁখি কুমারসাথে জাগিল রাজভ্রাতা।

নিভৃত ঘরে ধূপের বাস, রতনদীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি শয্যাতলে শুধালো রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি বক্ষে তুলি দিল।
আপনপানে নেহারি চেয়ে শরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হয়ে চকিত চোখে চাহিল চারি দিকে—
বিজন গৃহ, রতনদীপ জ্বলিছে অনিমিখে।
গলার মালা খুলিয়া লয়ে ধরিয়া দুটি করে
সোনার-সুতে-যতনে-গাঁথা লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম, পড়িল লিপি তার,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে পড়িল শতবার।
শয়নশেষে রহিল বসে, ভাবিল রাজবালা—
'আপন ঘরে ঘুমায়েছিনু নিতান্ত নিরালা,
কে পরালে মালা!'

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক।
বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নবীন ফুলমঞ্জরীর গন্ধ লয়ে আসে।
জাগিয়া উঠি বৈতালিক গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে বাঁশিতে উঠে তান।
শীতলছায়া নদীর পথে কলসে লয়ে বারি,
কাঁকন বাজে, নূপুর বাজে, চলিছে পুরনারী।
কাননপথে মর্মরিয়া কাঁপিছে গাছপালা,
আধেক মুদি নয়নদুটি ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

বারেক মালা গলায় পরে, বারেক লহে খুলি,
দুইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি।
শয়ন'পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে পাইবে যেন অধিক পরিচয়।
জগতে আজ কত-না ধ্বনি উঠিছে কত ছলে,
একটি আছে গোপন কথা সে কেহ নাহি বলে।
বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হুহু,
কোকিল শুধু অবিশ্রাম ডাকিছে কুহু-কুহু।
নিভৃত ঘরে পরান-মন একান্ত উতালা,
শয়নশেষে নীরবে ব'সে ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

কেমন বীর-মুরতি তার মাধুরী দিয়ে মিশা—
দীপ্তি-ভরা নয়নমাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা।
স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিস্ময়।
পারশে যেন বসিয়াছিল, ধরিয়াছিল কর—
এখনো তার পরশে যেন সরস কলেবর।
চমকি মুখ দু হাতে ঢাকে, শরমে টুটে মন—
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন নিভে নি সেই ক্ষণ!
কণ্ঠ হতে ফেলিল হার যেন বিজুলিজ্বালা,
শয়ন'পরে লুটায়ে প'ড়ে ভাবিল রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

এমনি ধীরে একটি ক'রে কাটিছে দিন রাতি,
বসন্ত সে বিদায় নিল লইয়া যূথী জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে, বরষে ঝরঝর্—
কাননে ফুটে নবমালতী কদম্বকেশর।

স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে পূর্ণিমামালিকা,
সকল বন আকুল করে শুভ্র শেফালিকা।
আসিল শীত সঙ্গে লয়ে দীর্ঘ দুখনিশা,
শিশির-ঝরা কুন্দফুলে হাসিয়া কাঁদে দিশা।
ফাগুন মাস আবার এল বহিয়া ফুলডালা,
জানালাপাশে একেলা ব'সে ভাবিছে রাজবালা—
'কে পরালে মালা!'

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণীমাঝে,
কনকনূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা—
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি,
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও—
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে।
মোহনমধুর মন্ত্র জানি নে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি—
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সোনার বাঁধন

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে,
অয়ি গৃহলক্ষ্মী, এই করুণক্রন্দন
এই দুঃখদৈন্যে-ভরা মানবের গেহে!
তাই দুটি বাহু'পরে সুন্দরবন্ধন
সোনার কঙ্কণদুটি বহিতেছে দেহে
শুভচিহ্ন, নিখিলের নয়ননন্দন।

পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ককঠিন
সংসারসংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধদ্বন্দ্ব যতকিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে—
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি
দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন দুখানি॥

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বৈষ্ণবকবিতা

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহমিলন,
বৃন্দাবনগাথা— এই প্রণয়স্বপন
শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে, এ কি শুধু দেবতার!
এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেমতৃষা!

এ গীত-উৎসব-মাঝে
শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে;
দাঁড়ায়ে বাহির-দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি

দুয়েকটি তান— দূর হতে তাই শুনে
তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্গুনে
অন্তর পুলকি উঠে— শুনি সেই সুর
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর
আমাদের ধরা— মধুময় হয়ে উঠে
আমাদের বনচ্ছায়ে যে নদীটি ছুটে,
মোদের কুটিরপ্রান্তে যে কদম্ব ফুটে
বরষার দিনে— সেই প্রেমাতুর তানে
যদি ফিরে চেয়ে দেখি মোর পার্শ্বপানে
ধরি মোর বামবাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে
ধরার সঙ্গিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে
মোর দিকে, বহি' নিজ মৌন ভালোবাসা,
ওই গানে যদি-বা সে পায় নিজভাষা,
যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি—
তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি ?

সত্য ক'রে কহো মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহতাপিত। হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে ?
বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি ! এত প্রেমকথা
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ কার
আঁখি হতে ! আজ তার নাহি অধিকার

সে সংগীতে ! তারি নারীহৃদয়সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন !

আমাদেরই কুটিরকাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতাচরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন-তরে— তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে— আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণবকবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুণ্ঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে সুধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার ; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চলমতিগতি।
দুই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্দর্যের দস্যু তারা
লুটেপুটে নিতে চায় সব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বাসিত প্রীতি,

এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া
বহে যায়— তাই তারা পড়েছে আসিয়া
সবে মিলি কলরবে সেই সুধাস্রোতে।
সমুদ্রবাহিনী সেই প্রেমধারা হতে
কলস ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু আপন কুটিরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যাঁর ধন তিনি ওই অপার সন্তোষে
অসীম স্নেহের হাসি হাসিছেন বসে।

১৮ আষাঢ় ১২৯৯

দুর্বোধ

তুমি মোরে পার না বুঝিতে?
প্রশান্ত বিষাদভরে
দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন-ভাবে স্থিরনতমুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করি নি গোপন।
যাহা আছে সব আছে
তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে
সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গণি
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার।

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো,
উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে—
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

এ যে, সখী, সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক্ হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্যনিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান' রানী—
এ তবু তোমার রাজধানী।

কী তোমারে চাহি বুঝাইতে?
গভীর হৃদয়মাঝে
নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সংগীতে—
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন।

এ যদি হইত শুধু সুখ,
কেবল একটি হাসি
অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরূক।
মুহূর্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়বারতা,
বলিতে হ'ত না কোনো কথা।

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল
দুই চক্ষে ছলছল্‌,
বিষণ্ণ অধর, ম্লান মুখ—
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হ'ত কথা।

এ যে, সখী, হৃদয়ের প্রেম—
সুখদুঃখবেদনার
আদি অন্ত নাহি যার—
চিরদৈন্য, চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে,
তাই আমি না পারি বুঝাতে।

নাই-বা বুঝিলে তুমি মোরে!
চিরকাল চোখে চোখে
নূতন-নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রিদিন ধ'রে।
বুঝা যায় আধো প্রেম, আধখানা মন—
সমস্ত কে বুঝেছে কখন?

১১ চৈত্র ১২৯৯

হৃদয়যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই-যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে?
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে—
হেথা শ্যাম দূর্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।
চাহিয়া বঞ্জুলবনে কী জানি পড়িবে মনে
বসি কুঞ্জে তৃণাসনে শ্যামল কূলে!
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।

যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।

নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি,
উচ্ছ্বসি পড়িবে আসি উরসে গলে—
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!
যদি গাহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।

যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে।
স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।
নাহি রাত্রি দিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।
যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে।

১২ আষাঢ় ১৩০০

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।
যখনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু মধুরহাসিনী—
বুঝিতে না পারি কী জানি কী আছে তোমার মনে।

নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দূরে পশ্চিমে ডুবিছে তপন গগনকোণে।
কী আছে হোথায়— চলেছি কিসের অন্বেষণে ?

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায় অপরিচিতা—
ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি অশ্রুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
ঊর্মিমুখর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে কথা না ব'লে।

হূহু ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত দীর্ঘশ্বাস।
অন্ধ আবেগে করে গর্জন জলোচ্ছ্বাস।
সংশয়ময় ঘননীলনীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বসি এ নীরব হাসি হাসিছ কেন ?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার বিলাস হেন।

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি 'কে যাবে সাথে',
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে নবীন প্রাতে।

দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল কথা না ব'লে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ, কখনো রবি—
কখনো ক্ষুব্ধ সাগর কখনো শান্ত ছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়,
সোনার তরণী কোথা চলে যায়—
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়—
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না ব'লে।

আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব কেশের রাশি।
বিকলহৃদয় বিবশশরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না নীরব হাসি।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০

চিত্রাঙ্গদা

১ অনঙ্গ-আশ্রম

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পঞ্চশর ?

মদন। আমি সেই মনসিজ,
টেনে আনি নিখিলের নরনারীহিয়া,
বেদনাবন্ধনে।

চিত্রাঙ্গদা। কী বেদনা, কী বন্ধন,
জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।
প্রভু, তুমি কোন্ দেব ?

বসন্ত। আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল ;
আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে
করি আক্রমণ ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।

চিত্রাঙ্গদা। প্রণাম তোমারে ভগবন্। চরিতার্থ
দাসী দেবদরশনে।

মদন। কল্যাণী, কী লাগি
এ কঠোর ব্রত তব ? তপস্যার তাপে
করিছ মলিন খিন্ন যৌবনকুসুম ;
অনঙ্গপূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কী চাও ভদ্রে ?

চিত্রাঙ্গদা। দয়া কর যদি,
শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা
তার পরে।

মদন। শুনিবারে রহিনু উৎসুক।

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুররাজকন্যা।
মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না—
দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য
মাতৃগর্ভে পশি দুর্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।

মদন। শুনিয়াছি
বটে। তাই তব পিতা পুত্রের সমান
পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্বিদ্যা,
রাজদণ্ডনীতি।

চিত্রাঙ্গদা। তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে ;
ফিরি স্বেচ্ছামতে ; নাহি জানি লজ্জা, ভয়,
অন্তঃপুরবাস ; নাহি জানি হাবভাব,
বিলাসচাতুরী ; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।

বসন্ত। সুনয়নে, সে বিদ্যা শিখে না কোনো নারী ;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সেই বোঝে।

চিত্রাঙ্গদা। একদিন
গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণানদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি অশ্ব দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি।

ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য-অন্ধকার
লতাগুল্মে-গহন-গম্ভীর মহারণ্যে
কিছুদূর অগ্রসরি দেখিনু সহসা—
রুধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে যেতে— নড়িল না, চাহিল না ফিরে।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না ; সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার, ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে শিখারূপে উঠে উর্ধ্বে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে— রোষদৃষ্টি
মিলালো পলকে, নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদুহাস্যরেখা
বুঝি সে বালকমূর্তি হেরিয়া আমার।
শিখে পুরুষের বিদ্যা, প'রে পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখে চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি,
সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

মদন। সে শিক্ষা আমারি
সুলক্ষণে। আমিই চেতন ক'রে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।

কী ঘটিল পরে ?

চিত্রাঙ্গদা। সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু, 'কে তুমি ?' শুনিনু উত্তর, 'আমি
পার্থ, কুরুবংশধর।'
রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ ! আজন্মের বিস্ময় আমার ?
শুনেছিনু বটে, সত্যপালনের তরে,
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন। এই সেই পার্থবীর !
বাল্যদুরাশায় কতদিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে ; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য ;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হা রে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্ধা তোর ! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্যবীর্য যাহা-কিছু ধুলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ সেই তাঁর
চরণের তলে।
কী ভাবিতেছিনু মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি ;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা ; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার। ছি ছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমাভিক্ষা ; বর্বরের মতো

রহিলি দাঁড়ায়ে, হেলা করি চলি গেলা
বীর। বাঁচিতাম, সে মুহূর্তে মরিতাম
যদি।

পরদিন প্রাতে, দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসংকোচে।

গোপনে গেলাম সেই বনে;
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।

মদন। ব'লে যাও বালা। মোর কাছে করিয়ো না
কোনো লাজ। আমি মনসিজ; মানসের
সকল রহস্য জানি।

চিত্রাঙ্গদা। মনে নাই ভালো,
তার পরে কী কহিনু আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্ররূপে,
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর!
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে
দুঃস্বপ্নবিহ্বলসম। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল,
'ব্রহ্মচারীব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'

পুরুষের ব্রহ্মচর্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে?
তুমি জান, মীনকেতু, কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বিসর্জন নারীপদতলে

চিরার্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য! গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহা-কিছু ছিল; কিণাঙ্কিত
এ কঠিন বাহু, ছিল যা গর্বের ধন
এতকাল মোর, লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিষ্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত।
অবলার কোমল মৃণালবাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার
তেজ।
হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
এক দণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া— সব বিদ্যা,
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়;
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদন। আমি হব সহায় তোমার
অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি আনি দিব সম্মুখে তোমার।
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা-ইচ্ছা। বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন।

চিত্রাঙ্গদা। সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাঁহার করিতাম

অধিকার ; নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্তপরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি ;
ভাবিতেন মনে মনে, 'এ কোন্ বালক,
পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মতো !'
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি,
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে ;
যে নারী নির্বাক্ ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্মবিধবা, আমি সে রমণী নহি ;
আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল।
নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি
নিশ্চয় সে দিবে ধরা। হায় হতবিধি,
সেদিন কী দেখেছিল ! শরমে কুঞ্চিত
শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল,
প্রলাপবাদিনী। কিন্তু আমি যথার্থ কি
তাই ? যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে
চারি দিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
তার চেয়ে বেশি নই আমি ? কিন্তু হায়,

আপনার পরিচয় দেওয়া বহু ধৈর্যে
বহু দিনে ঘটে— চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি
দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ।
হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাসুন্দর
ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও— জন্মদাতা বিধাতার
বিনা দোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ।
করো মোরে অপূর্ব সুন্দরী। দাও মোরে
সেই এক দিন, তার পরে চিরদিন
রহিল আমার হাতে।
যখন প্রথম
দেখিলাম তারে, যেন মুহূর্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে।
বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছ্বাসে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন!
হে বসন্ত, হে বসন্তসখে, সে বাসনা
পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে।

মদন। তথাস্তু।

বসন্ত। তথাস্তু। শুধু এক দিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি।

২ মণিপুর। অরণ্যে শিবালয়

অর্জুন। কাহারে হেরিনু! সে কি সত্য কিম্বা মায়া!
নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী ;
এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয়,
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান ক'রে যায়, গভীর পূর্ণিমারাত্রে
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শস্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত অঞ্চলে।
সেথা তরু-অন্তরালে
অপরাহ্নবেলাশেষে ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা, সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখসুখ উলটি পালটি—
জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত মানবের।
হেনকালে ঘনতরু-অন্ধকার হতে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া কে আসি দাঁড়ালো
সরোবরসোপানের শ্বেত শিলাপটে।
কী অপূর্ব রূপ! কোমলচরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল!
উষার কনকমেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায় পূর্বপর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকাশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে
কৌতূহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া ;

উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মৃদু হাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ ; মুক্ত কেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি, পরশের রসে
কোমল কাতর, প্রেমের-করুণা-মাখা।
নিরখিলা নত করি শির পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুক্ত বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতনু-তলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস। সরোবরে
পা-দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা।— বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেতশতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মুদি ; যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। —ক্ষণপরে
কী জানি কী দুখে হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হল দুটি আঁখি ; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি ;
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চ'লে গেল
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লানমুখ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃদুপদে।

ভাবিলাম মনে, ধরণী খুলিয়া দিল
ঐশ্বর্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম,
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষগৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে—
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণচরণতলে।
আর একবার যদি— কে দুয়ার ঠেলে ?

দ্বার খুলিয়া

এ কী ! সেই মূর্তি ! শান্ত হও হে হৃদয় !—

কোনো ভয় নাই মোরে, বরাননে ! আমি
ক্ষত্রকুলজাত, ভয়ভীত দুর্বলের
ভয়হারী।

চিত্রাঙ্গদা। আর্য, তুমি অতিথি আমার।
এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি
কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কী সৎকারে
তোমারে তুষিব আমি।

অর্জুন। অতিথিসৎকার
তব দরশনে হে সুন্দরী। শিষ্টবাক্য
সমূহ সৌভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি—
চিত্ত মোর কুহতুলী।

চিত্রাঙ্গদা। শুধাও নির্ভয়ে।

অর্জুন। শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি

জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি
হেলায় দিতেছ বিসর্জন, হতভাগ্য
মর্তজনে করিয়া বঞ্চিত ?

চিত্রাঙ্গদা। গুপ্ত এক
কামনা সাধনা -তরে একমনে করি
শিবপূজা।

অর্জুন। হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন ! সুদর্শনে,
উদয়শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি ; সপ্তদ্বীপমাঝে
যেখানে যা-কিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চোখে ;
কী চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা। ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি, আমি যাঁরে চাহি।

অর্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায় ! কার যশোরাশি
অমরকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন ?
কহ নাম তার, শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জুন। মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায়, ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা ক'রে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা এ দুর্লভ

সৌন্দর্যসম্পদে। কহ শুনি, সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে!

চিত্রাঙ্গদা। পরকীর্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসী!
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবনমাঝে
রাজবংশচূড়া।

অর্জুন। কুরুবংশ!

চিত্রাঙ্গদা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী—
নাম শুনিয়াছ?

অর্জুন। বলো, শুনি তব মুখে।

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারীহৃদয় পূর্ণ করি।
ব্রহ্মচারী,
কেন এ অধৈর্য তব? তবে মিথ্যা এ কি?
মিথ্যা সে অর্জুন নাম? কহ এই বেলা—
মিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক সে উড়ে উড়ে
শূন্যে শূন্যে মুখে মুখে। তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

অর্জুন। অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্যবীর্য তার,
মিথ্যা হোক সত্য হোক, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থান দান, সেথা হতে

আর তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্য-সম।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পার্থ?

অর্জুন। আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দ্বারে
প্রেমার্ত অতিথি।

চিত্রাঙ্গদা। শুনেছিনু, ব্রহ্মচর্য
পালিছে অর্জুন দ্বাদশ-বরষ-ব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি!— হে সন্ন্যাসী, তুমি পার্থ!

অর্জুন। তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি
যেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

চিত্রাঙ্গদা। ধিক্, পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত! মুহূর্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে! মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা! কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা—
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে,
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার।

অর্জুন। খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি— আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি! এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রামরূপিণী। কেন জানি, অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে
অন্ধকারমহার্ণবে সৃষ্টিশতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্তের মাঝে। আর-সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহুদিনে; তোমাপানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে,
তবু পাই নাই শেষ।— কৈলাসশিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত তৃষিত তাপিত
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুরসরসীর সলিলের পানে
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত অতল।
স্বচ্ছ জল যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণমৃণাল-সাথে মিশি নেমে গেছে
অগাধ অসীমে; কাঁপিতেছে আঁকিবাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষকোটি অগ্নিময়ী
নাগিনীর মতো। মনে হল, ভগবান
সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া

দিলেন দেখায়ে জন্মশ্রান্ত কর্মক্লান্ত
মর্তজনে— কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারি দিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোকমাঝে
কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণনির্বাপণ।

চিত্রাঙ্গদা। আমি নহি, আমি নহি, হায়, পার্থ, হায়,
কোন্ দেবের ছলনা! যাও যাও, ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর! মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।

৩ তরুতলে

চিত্রাঙ্গদা। হায় হায়, সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের
তৃষার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো; সেই নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে, কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা! এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি?

বসন্ত ও মদনের প্রবেশ

হে অনঙ্গদেব, এ কী রূপহুতাশনে
ঘিরেছ আমারে— দগ্ধ হই, দগ্ধ ক'রে
মারি।

মদন। বলো, তন্বী, কালিকার বিবরণ।
মুক্ত পুষ্পশর মোর কোথা কী সাধিল
কাজ, শুনিতে বাসনা।

চিত্রাঙ্গদা। কাল সন্ধ্যাবেলা
সরসীর তৃণপুঞ্জতীরে পেতেছিনু
পুষ্পশয্যা বসন্তের ঝরা ফুল দিয়ে।
শ্রান্ত কলেবরে শুয়েছিনু আনমনে;
রাখিয়া অলস শির বাম বাহু'পরে
ভাবিতেছিলাম গত দিবসের কথা।
শুনেছিনু যেই স্তুতি অর্জুনের মুখে
আনিতেছিলাম তাহা মনে; দিবসের
সঞ্চিত অমৃত হতে বিন্দু বিন্দু ল'য়ে
করিতেছিলাম পান; ভুলিতেছিলাম
পূর্ব-ইতিহাস, গতজন্মকথাসম।
যেন আমি রাজকন্যা নহি; যেন মোর
নাই পূর্বপর। যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা
পরমায়ু— তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর; পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুমাইয়া গ্রীবা,
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন— মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদি-অন্ত-হারা।

বসন্ত। একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন
হে সুন্দরী।

মদন। সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের

তানে গুঞ্জরি কাঁদিয়া উঠে অন্তহীন
কথা। তার পরে বলো।

চিত্রাঙ্গদা। ভাবিতে ভাবিতে
সর্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণশাখা হতে
ফুল্ল মালতীর লতা আলস্য-আবেশে
মোর গৌরতনু-'পরে পাঠাইতেছিল
নিঃশব্দ চুম্বন; ফুলগুলি কেহ চুলে,
কেহ পদতলে, কেহ স্তনতটমূলে
বিছাইল আপনার মরণশয়ন।

অচেতনে গেল কতক্ষণ। হেনকালে
ঘুমঘোরে কখন্ করিনু অনুভব
যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে
রভসলালসে মোর নিদ্রালস তনু!
চমকি উঠিনু জাগি।

দেখিনু, সন্ন্যাসী
পদপ্রান্তে নির্নিমেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থির প্রতিমূর্তিসম। পূর্বাচল হতে
ধীরে ধীরে স'রে এসে পশ্চিমে হেলিয়া
দ্বাদশীর শশী সমস্ত হিমাংশুরাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্খলিতবসন মোর
অম্লান নূতন শুভ্র সৌন্দর্যের 'পরে।
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ তরুতল; ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামগ্ন নিশীথিনী; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া; সুপ্ত বায়ু;

শিরে লয়ে জ্যোৎস্নালোকে মসৃণ চিক্কণ
রাশি রাশি অন্ধকার পল্লবের ভার
স্তম্ভিত অটবী। সেইমত চিত্রার্পিত
দাঁড়াইয়া দীর্ঘকায় বনস্পতিসম
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর।

প্রথম সে নিদ্রাভঙ্গে চারি দিক চেয়ে
মনে হল, কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদোষে
জীবন ত্যজিয়া, স্বপ্নজন্ম লভিয়াছি
কোন্-এক অপরূপ মোহনিদ্রালোকে
জনশূন্য ম্লানজ্যোৎস্না বৈতরণীতীরে।

দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতো
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে! প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে মোর এক দেহমাঝে
জন্ম জন্ম শত জন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, "লহ, লহ, যাহা-কিছু আছে
সব লহ, জীবনবল্লভ!" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।— চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের
প্রথম সংগীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে শয্যাতলে উঠিয়া বসিনু।
দেখিনু চাহিয়া, সুখসুপ্ত বীরবর;

শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ ; নিপতিত
উন্নত ললাটপটে অরুণের আভা,
মর্তলোকে যেন নব উদয়পর্বতে
নবকীর্তিসূর্যোদয় পাইবে প্রকাশ।

উঠিনু শয়ন ছাড়ি নিশ্বাস ফেলিয়া ;
মালতীর লতাজাল দিলাম নামায়ে
সাবধানে, রবিকর করি অন্তরাল
সুপ্তমুখ হতে। দেখিলাম, চতুর্দিকে
সেই পূর্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবী।
আপনারে আরবার মনে পড়ে গেল—
ছুটিয়া পলায়ে এনু নবপ্রভাতের
শেফালিবিকীর্ণ তৃণবনস্থলী দিয়ে
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মতো।
বিজনবিতানতলে বসি, করপুটে
মুখ আবরিয়া কাঁদিবারে চাহিলাম—
এল না ক্রন্দন।

মদন। হায়, মানবনন্দিনী,
স্বর্গের সুখের দিন স্বহস্তে ভাঙিয়া
ধরণীর এক রাত্রি পূর্ণ করি তাহে
যত্নে ধরিলাম তব অধরসম্মুখে—
শচীর প্রসাদসুধা, রতির চুম্বিত,
নন্দনবনের গন্ধে মোদিতমধুর—
তোমারে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন!

চিত্রাঙ্গদা। কারে, দেব, করাইলে পান! কার তৃষা
মিটাইলে! সে চুম্বন, সে প্রেমসংগম

এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝংকার-সম, সে তো মোর নহে!
বহুকাল সাধনায় একদণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন; সে মিলন
কে লইল লুটি আমারে বঞ্চিত করি!
সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি
সঙ্গে ক'রে ঝ'রে প'ড়ে যাবে, অতিস্ফুট
পুষ্পদলসম, এ মায়ালাবণ্য মোর;
অন্তরের দরিদ্র রমণী রিক্তদেহে
ব'সে রবে চিরদিনরাত। মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কী অভিসম্পাত! চিরন্তনতৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান। সেই প্রেমদৃষ্টিপাত
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা, সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম চিররাত্রিতাপসিনী
কুমারী -হৃদয়পদ্ম-পানে ছুটে এল;
সে তাহারে লইল ভুলায়ে।

মদন। কল্য নিশি
ব্যর্থ গেছে তবে। শুধু, কূলের সম্মুখে
এসে আশার তরণী, গেছে ফিরে ফিরে
তরঙ্গ-আঘাতে?

চিত্রাঙ্গদা। কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব! সুখস্বর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি

করি নি গণনা আত্মবিস্মরণসুখে।
আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যধিক্কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে আমার আকাঙ্ক্ষাতীর্থ
বাসরশয্যায়, অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর? হে অতনু,
বর তব ফিরে লও।

মদন। যদি ফিরে লই—
ছলনার আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পার্থের সম্মুখে কুসুমপল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা? প্রমোদের
প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে
সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ কর যদি
ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভরে
চমকিয়া কী আক্রোশে হেরিবে তোমায়!

চিত্রাঙ্গদা। সেও ভালো। এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চ'লে যান যদি, বুক ফেটে

মরি যদি আমি, তবু আমি 'আমি' রব।
সেও ভালো ইন্দ্রসখা!

বসন্ত। শোনো মোর কথা!
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া প'ড়ে যাবে তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল, আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্গুনী।
যাও ফিরে যাও, বৎসে, যৌবন-উৎসবে।

৪ অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। কী দেখিছ বীর?

অর্জুন। দেখিতেছি পুষ্পবৃন্ত
ধরি, কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে
মালা; নিপুণতা চারুতায় দুই বোনে
মিলি, খেলা করিতেছে যেন সারাবেলা
চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।
দেখিতেছি আর ভাবিতেছি।

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ?

অর্জুন। ভাবিতেছি, অমনি সুন্দর ক'রে ধ'রে
সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রসে
প্রবাসদিবসগুলি গেঁথে গেঁথে, প্রিয়ে,
অমনি রচিবে মালা; মাথায় পরিয়া
অক্ষয়-আনন্দ-হার গৃহে ফিরে যাব।

চিত্রাঙ্গদা। এ প্রেমের গৃহ আছে?

অর্জুন। গৃহ নাই?

চিত্রাঙ্গদা। নাই।
গৃহে নিয়ে যাবে! বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের; নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে
অনাদরে পাষাণের মাঝে? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে, দিনান্তে আমার খেলা
সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের
শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোনো
খেদ রহিবে না কারো মনে।

অর্জুন। এই শুধু?

চিত্রাঙ্গদা। শুধু এই। বীরবর, তাহে দুঃখ কেন?
আলস্যের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল
আলস্যের দিনে তাহা ফেলো শেষ ক'রে।
সুখেরে তাহার বেশি একদণ্ডকাল
বাঁধিয়া রাখিলে, সুখ দুঃখ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখো। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।

দিন গেল।
এই মালা পরো গলে। শ্রান্ত মোর তনু
ওই তব বাহু-'পরে টেনে লও বীর।

সন্ধি হোক অধরের সুখসম্মিলনে
ক্ষান্ত করি মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে
এসো, বন্দী করি দোঁহে দোঁহা প্রণয়ের
সুধাময় চিরপরাজয়ে।

অর্জুন। ওই শোনো,
প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

৫ মদন ও বসন্ত

মদন। আমি পঞ্চশর, সখা— এক শরে হাসি,
অশ্রু এক শরে; এক শরে আশা, অন্য
শরে ভয়; এক শরে বিরহমিলন
আশাভয় দুঃখসুখ এক নিমেষেই।

বসন্ত। শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সখা! হে অনঙ্গ,
সাঙ্গ করো রণরঙ্গ তব। রাত্রিদিন
সচেতন থেকে, তব হুতাশনে আর
কতকাল করিব ব্যজন! মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভস্মে ম্লান হয়ে আসে তপ্তদীপ্তিরাশি।
চমকিয়া জেগে, আবার নূতন শ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জ্বলতা।
এবার বিদায় দাও সখা!

মদন। জানি তুমি
অনন্ত অস্থির, চিরশিশু; চিরদিন
বন্ধনবিহীন হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত যতনে যারে
তুলিছ সুন্দর করি বহুকাল ধ'রে,

নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি ধূলিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই ;
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে,
তব পক্ষ-সমীরণে, হুহু করি কোথা
যেতেছে উড়িয়া চ্যুত পল্লবের মতো।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

৬ অরণ্যে

অর্জুন। আমি যেন পাইয়াছি প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হতে, স্বপ্নলব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরায় ;
ধরে রাখে এমন কিরীট নাই কোথা,
গেঁথে রাখে হেন সূত্র নাই, ফেলে যাই
হেন নরাধম নহি— তারে লয়ে তাই
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বদ্ধ হয়ে প'ড়ে আছে কর্তব্যবিহীন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ ?

অর্জুন। ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখো, বৃষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে
পর্বতের 'পরে ; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া ; নির্ঝরিণী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব-উপহাসে তটের তর্জন
করিতেছে অবহেলা। মনে পড়িতেছে,
এমনি বর্ষার দিনে পঞ্চ ভ্রাতা মিলে
চিত্রক-অরণ্য-তলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্নিগ্ধ অন্ধকারে

কাটিত উৎসাহে ; গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হৃদয় ; ঝরঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝরকলোল্লাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
মৃগ ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা
রেখে যেত পথপঙ্ক-'পরে, দিয়ে যেত
আপনার গৃহের সন্ধান ; কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত। শিকার সমাধা হলে
পঞ্চ সঙ্গী পণ করি মোরা, সন্তরণে
হইতাম পার বর্ষার সৌভাগ্যগর্বে-
স্ফীত তরঙ্গিণী। সেইমত বাহিরিব
মৃগয়ায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাঙ্গদা। হে শিকারী,
যে মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই
হোক শেষ। তবে কি জেনেছ স্থির—
এই স্বর্ণমায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে
ধরা ? নহে, তাহা নহে। এ বন্য হরিণী
আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি।
চকিতে ছুটিয়া যায়, কে জানে কখন
স্বপনের মতো। ক্ষণিকের খেলা সহে,
চিরদিবসের পাশ বহিতে পারে না।
ওই চেয়ে দেখো, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে, শ্যাম বর্ষা হানিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠ-'পরে,
তবু সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয়, তোমাতে আমাতে, নাথ,
সেইমত খেলা, আজি বরষার দিনে—
চঞ্চলারে করিবে শিকার প্রাণপণ

করি, যত শর যত অস্ত্র আছে তূণে
একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ।
কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়; কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টিবরিষন, কভু দীপ্ত বজ্রজ্বালা।
মায়ামৃগী ছুটিয়া বেড়ায় মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন।

৭ মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। হে মন্মথ, কী জানি কী দিয়েছ মাখায়ে
সর্বদেহে মোর। তীব্র মদিরার মতো
রক্তসাথে মিশে, উন্মাদ করেছে মোরে।
আপনার গতিগর্বে মত্ত মৃগী আমি
ধাইতেছি মুক্তকেশে, উচ্ছ্বসিত বেশে,
পৃথিবী লঙ্ঘিয়া। ধনুর্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহতপ্রায়; ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে। নির্দয়বিজয়সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায়
ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়, একদণ্ড
স্থির হলে পাছে, ক্রন্দনে হৃদয় ভ'রে
ফেটে পড়ে যায়।

মদন। থাক্। ভাঙিয়ো না খেলা।
এ খেলা আমার। ছুটুক ফুটুক বাণ,
টুটুক হৃদয়। আমার মৃগয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ষায়।
দাও দাও শ্রান্ত করে দাও; করো তারে

পদানত, বাঁধো তারে দৃঢ় পাশে ; দয়া
করিয়ো না, হাসিতে জর্জর করে দাও ;
অমৃতে-বিষেতে-মাখা খরবাক্যবাণ
হানো বুকে। শিকারে দয়ার বিধি নাই।

৮ অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

অর্জুন। কোনো গৃহ নাই তব, প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন ?
নিত্য স্নেহসেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন ক'রে, যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে ? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই ?

চিত্রাঙ্গদা। প্রশ্ন কেন ? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে ?
যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই-যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে ? এর কি শুধায় কেহ পরিচয় ?
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জুন। কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে ? এক-
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে 'পড়ে
গেছে ?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের

কুসুমেরে।

অর্জুন। তাই সদা হারাই-হারাই
করে প্রাণ ; তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এসো।
নামধাম-গোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে
সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে!
চারি পার্শ্ব হতে ঘেরি পরশি তোমারে।
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস। নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়মন্দিরমাঝে? গোত্র নাই? তবে
কী মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?

চিত্রাঙ্গদা। নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানে নি। সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

অর্জুন। তাহারে যে ভালোবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে, সুদিনে দুর্দিনে।

চিত্রাঙ্গদা। এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরই
মাঝে? হায় হায়, এখন বুঝিনু, পুষ্প
স্বল্পপরমায়ু দেবতার আশীর্বাদে।
গত বসন্তের যত মৃতপুষ্পসাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু,
আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে
পার্থ! যে কদিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুতূহলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিঃশেষ করিয়া করো পান। এর পরে

বারবার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে ফিরে, গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে তৃষিত ভৃঙ্গের মতো।

৯ বনচরগণ ও অর্জুন

বনচর। হায় হায়, কে রক্ষা করিবে!
অর্জুন। কী হয়েছে?
বনচর। উত্তরপর্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্বত্য বন্যার
মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।
অর্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই?
বনচর। রাজকন্যা
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন;
তাঁর ভয়ে, রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থপর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।
অর্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী?
বনচর। এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।

[প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ?
অর্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি, তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।

চিত্রাঙ্গদা। কুৎসিত, কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে।

অর্জুন। কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, সেই
তার মন্দভাগ্য। নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালোবাসা— শুধু সুমধুর ছলে
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে, বেঁকে বেঁধে, হেসে কেঁদে,
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা—
তবে তার সার্থক জনম। কী হইবে
কর্মকীর্তি, বীর্যবল, শিক্ষাদীক্ষা তার?
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বনপথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে,
ওই দেবালয়মাঝে, হেসে চলে যেতে।
হায় হায়, আজ এত হয়েছে অরুচি
নারীর সৌন্দর্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের স্বাদ!

এসো, নাথ, ওই দেখো
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্নশয়ন
কচি কচি পীতশ্যাম কিশলয় তুলি
আর্দ্র করি ঝরনার শীকরনিকরে।
গভীর পল্লবছায়ে বসি ক্লান্তকণ্ঠে

কাঁদিছে কপোত 'বেলা যায়' 'বেলা যায়'
বলি। কুলুকুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এসো, নাথ, বিরল বিরামে।

অর্জুন। আজ নহে
প্রিয়ে।

চিত্রাঙ্গদা। কেন নাথ?

অর্জুন। শুনিয়াছি, দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীতজনে
করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা। কোনো ভয় নাই প্রভু!
তীর্থযাত্রাকালে রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।

অর্জুন। তবু আজ্ঞা করো, প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে আসি কর্তব্যসন্ধান। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।
সুমধ্যমে, ক্ষীণকীর্তি এই ভুজদ্বয়
পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি আনি
তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব,
হবে তব যোগ্য উপাধান।

চিত্রাঙ্গদা। যদি আমি
না'ই যেতে দিই? যদি বেঁধে রাখি? ছিন্ন
করে যাবে? তাই যাও। কিন্তু, মনে রেখো,
ছিন্ন লতা জোড়া নাহি লাগে। যদি তৃপ্তি

হয়ে থাকে, তবে যাও, করিব না মানা।
যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে
রেখো, চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী কারো তরে
বসে নাহি থাকে ; সে কাহারো সেবাদাসী
নহে ; তার সেবা করে নরনারী, অতি
ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাখে চোখে চোখে
যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে
যারে সুখের কলিকা, কর্মক্ষেত্র হতে
ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার
দলগুলি ফুটে ঝরে পড়ে গেছে ভূমে ;
সব কর্ম ব্যর্থ মনে হবে ; চিরদিন
রহিবে জীবনমাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি
ক্ষুধাতুরা। এসো, নাথ, বোসো। কেন আজি
এত অন্যমন ? কার কথা ভাবিতেছ ?
চিত্রাঙ্গদা ? আজ তার এত ভাগ্য কেন ?

অর্জুন। ভাবিতেছি, বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত। কী অভাব তার ?

চিত্রাঙ্গদা। কী অভাব তার ! কী ছিল সে অভাগীর ?
বীর্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করি
রুদ্ধমান রমণীহৃদয়। রমণী তো
সহজেই অন্তরবাসিনী, সংগোপনে
থাকে আপনাতে ; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি ? কী অভাব তার !
অরুণলাবণ্যলেখাচিরনির্বাপিত
উষার মতন, যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে থাকে

বীর্যশৈলশৃঙ্গ-'পরে নিত্য-একাকিনী,
কী অভাব তার ! থাক্ থাক্ তার কথা,
পুরুষের শ্রুতিসুমধুর নহে তার
ইতিহাস।

অর্জুন। বলো বলো। শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরজনীতে।
নদীগিরিবনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জন ; প্রভাতপ্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক—
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুকহৃদয়ে
তারি তরে। বলো বলো, শুনি তার কথা।

চিত্রাঙ্গদা। কী আর শুনিবে ?

অর্জুন। দেখিতে পেতেছি তারে—
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে,
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মতো আর্ত প্রজাগণে
করিতেছে বরাভয়দান। দরিদ্রের
সংকীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি সেথা করিছেন দয়াবিতরণ।
সিংহিনীর মতো, চারি দিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া ; শত্রু
কেহ, কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন

মুক্তলজ্জা ভয়হীনা প্রসন্নহাসিনী,
বীর্যসিংহ-'পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।
রমণীর কমনীয় দুই বাহু-'পরে
স্বাধীন সে অসংকোচ বল, ধিক্ থাক্
তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কণকিঙ্কিণী।
অয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন
এ পরান মোর উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘশীতসুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মতো।
এসো এসো দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মতো। বাহিরিয়া
যাই এই রুদ্ধসমীরণ, এই তিক্ত
পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর
অরণ্যের অন্ধগর্ভ হতে।

চিত্রাঙ্গদা। হে কৌন্তেয়,
যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা,
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
এই রূপ, ছিন্ন ক'রে ঘৃণাভরে ফেলি
পদতলে, পরের বসনখণ্ডসম—
সে ক্ষতি কি সহিতে পারিবে? কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের
তেজস্বী তরুণ তরু-সম বায়ুভরে
আনম্রসুন্দর, কিন্তু লতিকার মতো
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত, সে কি ভালো
লাগিবে পুরুষচোখে!— থাক্ থাক্, তার
চেয়ে এই ভালো। আপন যৌবনখানি

হৃদিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া
সযতনে, পথ চেয়ে বসিয়া রহিব ;
অবসরে আসিবে যখন আপনার
সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পূরিয়া
করাইব পান ; সুখস্বাদে শ্রান্তি হলে
চলে যাবে কর্মের সন্ধানে ; পুরাতন
হলে, যেথা স্থান দিবে সেথায় রহিব
পার্শ্বে পড়ি। যামিনীর নর্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্তসম
দক্ষিণহস্তের অনুচর, সে কি ভালো
লাগিবে বীরের প্রাণে !

অর্জুন। বুঝিতে পারি নে
আমি রহস্য তোমার। এতদিন আছি,
তবু যেন পাই নি সন্ধান। তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা ;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বনরত্ন, আলিঙ্গনসুধা ;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম, প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে। তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি, মনে হয়,
মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত
শিল্পযবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়—
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল

করি। নিত্যদীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস ; মাঝে মাঝে
ছলছল ক'রে ওঠে, মুহূর্তের মাঝে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি।
সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি ; তার পরে
সত্য দেখা দেয় ভূষণবিহীন রূপে
আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে ; দাও তারে।
আমার যে সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের।

অশ্রু কেন

প্রিয়ে! বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই
ব্যাকুলতা! বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে?
তবে থাক্, তবে থাক্। ওই মনোহর
রূপ পুণ্যফল মোর। এই-যে সংগীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্তসমীরে
এ যৌবনযমুনার পরপার হতে,
এই মোর বহুভাগ্য। এ বেদনা মোর
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক
আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে
হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয় প্রিয়ে!

১০ মদন বসন্ত ও চিত্রাঙ্গদা

মদন। শেষ রাত্রি আজি।

বসন্ত। আজ রাত্রি-অবসানে

তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনস্মৃতি
ভুলে গিয়ে তব ওষ্ঠরাগ, দুটি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরন তব শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া নূতন তনু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্বপ্নের মতো নব জাগরণে।

চিত্রাঙ্গদা। হে অনঙ্গ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে
এ মুমূর্ষু রূপ মোর শেষ রজনীতে
অন্তিম শিখার মতো শ্রান্ত প্রদীপের,
আচম্বিতে উঠুক উজ্জ্বলতম হয়ে।

মদন। তবে তাই হোক। সখা, দক্ষিণপবন
দাও তবে নিশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে।
অঙ্গে অঙ্গে উঠুক উচ্ছ্বসি পুনর্বার
নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্রোত।
আজি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে, নিশীথের
নিদ্রাভেদ করি ভোগবতী তটিনীর
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিব
বাহুপাশে-বদ্ধ দুটি প্রেমিকের তনু।

১১ শেষ রাত্রি

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলই কি
করিয়াছ পান? আর-কিছু বাকি আছে?

আর-কিছু চাও ? আমার যা-কিছু ছিল
সব হয়ে গেছে শেষ ? হয় নাই, প্রভু—
ভালো হোক, মন্দ হোক, আরো-কিছু বাকি
আছে, সে আজিকে দিব।

প্রিয়তম, ভালো
লেগেছিল ব'লে করেছিনু নিবেদন
এ সৌন্দর্যপুষ্পরাশি চরণকমলে,
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়। যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা করো, প্রভু, নির্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দিরবাহিরে। এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে।

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মতো, প্রভু, এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর।
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে, কত দৈন্য আছে— আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা। সংসারপথের
পান্থ, ধূলিলিপ্তবাস, বিক্ষতচরণ—
কোথা পাব কুসুমলাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা! কিন্তু, আছে
অক্ষয় অমর এক রমণীহৃদয়।
দুঃখ-সুখ আশা-ভয় লজ্জা-দুর্বলতা—
ধূলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান—
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা, তার
কত ভালোবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে

আছে এক সাথে। আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জন্মজন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও।

সূর্যোদয়

অবগুণ্ঠন খুলিয়া

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে, শিবালয়ে, দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আবরণে
ভারাক্রান্ত করি তার রূপহীন তনু।
কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষপ্রথায়
আরাধনা ; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি ; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয় ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই ; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে—
তখন জানিবে মোরে প্রিয়তম !
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অর্জুন। প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

পাণ্ডুয়া। কটক
২৮ ভাদ্র ১২৯৮

উর্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী !
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয় -সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুন্ঠিতা।

বৃন্তহীন পুষ্প -সম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্বশী !
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকাবয়সী,
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী !
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মানিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা !
মণিদীপদীপ্ত কক্ষে সমুদ্রের কল্লোলসংগীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবালপালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে !

যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে-গঠিতা,
পূর্ণপ্রস্ফুটিতা।

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী,
হে অপূর্বশোভনা উর্বশী!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারি ভিতে,
মধুমত্তভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে
উদ্দাম সংগীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা—
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে।

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা;
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার

অরবিন্দ-মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার—
অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিণী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনী।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২

বিজয়িনী

অচ্ছোদসরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায়সঘন
পল্লবশয়নতলে; মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্ছিত বনের কোলে; কপোতদম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চুচুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেতশিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে এক প্রান্তে স্খলিতগৌরব
অনাদৃত; শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে, আয়ুপরিশেষ
মূর্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে; নূপুর রয়েছে পড়ি;
বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি

ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনকদর্পণখানি চাহে শূন্য-পানে
কার মুখ স্মরি। স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দনকুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লানসুন্দর
শ্বেতকরবীর মালা; ধৌত শুক্লাম্বর
লঘুস্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মতো।
পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুক-ভরা আলিঙ্গনরাশি। সরসীর
প্রান্তদেশে বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী, কম্পমান ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছ নীরে, বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ; নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধ-'পরে, কহিতেছে বারম্বার
স্নেহের প্রলাপবাণী; কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশবিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়ারৌদ্রকরে,
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্মরে,
বসন্তদিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশবীণার

রবিরশ্মিতন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সংগীতঝংকারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল, মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি ; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল ; বিফল কাকলি
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি ; ছায়ায় অদূরে
সরোবরপ্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্যকিংকিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল ; তৃণাঞ্চিত তীরে
জলকলকলস্বরে মধ্যাহ্নসমীরে
সারস ঘুমায়ে ছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গিভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি
ধূসর ডানার মাঝে ; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বরচঞ্চল
ত্যজি কোন্‌ দূরনদীসৈকতবিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিতনীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ ব'হে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়া ছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু-'পরে,
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে।

পীত উত্তরীয়প্রান্ত লুন্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতীমালা কুঞ্চিত কুন্তলে
গৌর কণ্ঠতটে— সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা। অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার নির্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে ; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধনয়ন মৃগ ; বসন্তপরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে ॥

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে ; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্নরৌদ্র— ললাটে, অধরে,
উরু-'পরে, কটিতটে, স্তনাগ্রচূড়ায়,
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারি পাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার ; সেবকের মতো

সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে ; ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ বিস্ময়ে মরিয়া।

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়ালো সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকালতরে। পরক্ষণে ভূমি-'পরে
জানু পাতি নির্বাক্ বিস্ময়-ভরে
নতশিরে পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদন-পানে
চাহিল সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

১ মাঘ ১৩০২

প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে করেছ সম্রাট্। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরবমুকুট ; পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর। তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট-মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ

তব রাজ-আস্তরণে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ। সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি; অমরবীণায়
উঠিয়াছে কী ঝংকার! নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশ বিদেশের
ভাষা, যুগ যুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান॥

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তীসতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘনিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদমর্মরে; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে শকুন্তলা আছে বসি,
করপদ্মতললীন ম্লান মুখশশী,
ধ্যানরতা; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশমন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনাসিঞ্চিত; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্তা কহিবার ছলে

সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনি ; ভিখারী শিবের কোল
সদা আগলিয়া আছে প্রিয়া পার্বতীরে
অনন্তব্যগ্রতাপাশে ; সুখদুঃখনীরে
বহে অশ্রুমন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায় ; বাঁশরির ব্যথাপূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয়সাথিরে ;— হাত ধ'রে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ
রবিচন্দ্রতারা, পরি নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব-অর্থ-ভরা ; চিরসুহৃদ্‌সমান
সর্বচরাচর।

হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন— সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার, কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ।
সেই শতসহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে এই তুচ্ছ কর্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কী কারণে। অয়ি মহীয়সী মহারানী,

তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান। আজি
এই-যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধা-পানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর ? তাহারা কি
পায় দেখিবারে— নিত্য মোরে আছে ঢাকি
মন তব অভিনব লাবণ্যবসনে ?
তব স্পর্শ, তব প্রেম, রেখেছি যতনে—
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি সর্ব দেহমন
পূর্ণ করি— রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগযুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে ; কমলার
চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্মল গগনের অনন্ত ললাট।
হে মহিমাময়ী, মোরে করেছ সম্রাট্‌।

১৪ মাঘ ১৩০০

রাত্রে ও প্রভাতে

কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি-'পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,

হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা
সরস বিম্বাধরে,
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
মধুর আবেশভরে।

তব অবগুণ্ঠনখানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি।
আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমলকোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন,
মুখে নাহি ছিল বাণী।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি—
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখী,
হাসিমুকুলিত-মুখে
কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
নবীনমিলনসুখে॥

আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠিছে বাজি

এই নির্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবীতীরে আজি।

দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণসিঁদুররেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি
প্রভাতে দিয়েছ দেখা!
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে—
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনতশিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে॥

১ ফাল্গুন ১৩০২

দিনশেষে

দিনশেষ হয়ে এল, আঁধারিল ধরণী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
'হাঁগো এ কাদের দেশে
বিদেশী নামিনু এসে'
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—

অমনি কথা না বলি
ভরা ঘট ছলছলি
নতমুখে গেল চলি তরুণী।
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী॥

নামিছে নীরব ছায়া ঘনবনশয়নে,
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।
স্থির জলে নাহি সাড়া,
পাতাগুলি গতিহারা,
পাখি যত ঘুমে সারা কাননে—
শুধু এ সোনার সাঁঝে
বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।
এ দেশ লেগেছে ভালো নয়নে।

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া-করা
ছেয়ে গেছে ঝরে-পড়া বকুলে।
সারি সারি নিকেতন,
বেড়া-দেওয়া উপবন,
দেখে পথিকের মন আকুলে।
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।

কাননে প্রাসাদচূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।

যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই
বেচাকেনা ফেলে যাই এখনি—
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী॥

২৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২

নারীর দান

একদা প্রাতে কুঞ্জতলে
অন্ধ বালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল
পুষ্পমালিকা!
কণ্ঠে পরি অশ্রুজল
ভরিল নয়নে,
বক্ষে লয়ে চুমিনু তার
স্নিগ্ধ বয়নে।
কহিনু তারে, 'অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে রমণী
কী ধন তুমি করিছ দান
না জান আপনি।
পুষ্পসম অন্ধ তুমি
অন্ধ বালিকা,
দেখ নি নিজে মোহন কী যে
তোমার মালিকা।'

২৫ মাঘ ১৩০২

মানসী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ, কত গন্ধ, ভূষণ কত-না—
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে, খনি হতে সোনা,
বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।

২৮ চৈত্র ১৩০২

নারী

তুমি এ মনের সৃষ্টি, তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে,
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।
যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে,
মনে হয় জন্ম-জন্ম আছ এ পরানে।
মানসীরূপিণী তুমি, তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্য-সাথে যাও মিলে মিশে।

চন্দ্রে তব মুখশোভা, মুখে চন্দ্রোদয়,
নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়।
মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি,
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
তার পরে মনগড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।

২৮ চৈত্র ১৩০২

গান

তুমি পড়িতেছ হেসে
তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।
যৌবনসমুদ্র-মাঝে
কোন্ পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার!
উচ্ছল পাগল নীরে
তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জন তীরে
কী খেলা তোমার!
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে
কত নৃত্যে কত সুরে
এস কাছে যাও দূরে
শতলক্ষ বার।
তুমি পড়িতেছ হেসে
তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।

জাগরণসম তুমি
আমার ললাট চুমি
উদিছ নয়নে।
সুষুপ্তির প্রান্ততীরে
দেখা দাও ধীরে ধীরে
নবীন কিরণে।
দেখিতে দেখিতে শেষে
সকল হৃদয়ে এসে
দাঁড়াও আকুলকেশে
রাতুলচরণে—
সকল আকাশ টুটে
তোমাতে ভরিয়া উঠে,
সকল কানন ফুটে
জীবনে যৌবনে।
জাগরণসম তুমি
আমার ললাট চুমি
উদিছ নয়নে।

২৯ চৈত্র ১৩০২

বর্ষামঙ্গল

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর-সরসা।
গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে।
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিতনয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা !
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা !

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী !
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার-রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী !

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে।
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

যূথীপরিমল আসিছে সজল সমীরে,
ডাকিছে দাদুরি তমালকুঞ্জতিমিরে—
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলো না,
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুমপরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা!
নীপশাখে, সখী, ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা!

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা—
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা।

১৭ বৈশাখ ১৩০৪

ভ্রষ্ট লগ্ন

শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,
জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে।
অলসচরণে বসি বাতায়নে এসে
নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।
এমন সময়ে অরুণধূসর পথে
তরুণ পথিক দেখা দিল রাজরথে।
সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,
মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।

শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি !'

গোধূলিবেলায় তখনো জ্বলে নি দীপ,
পরিতেছিলাম কপালে সোনার টিপ,
কনকমুকুর হাতে লয়ে বাতায়নে
বাঁধিতেছিলাম কবরী আপন-মনে।
হেনকালে এল সন্ধ্যাধূসর পথে
করুণনয়ন তরুণ পথিক রথে।
ফেনায় ঘর্মে আকুল অশ্বগুলি,
বসনে ভূষণে ভরিয়া গিয়াছে ধূলি।
শুধালো কাতরে 'সে কোথায়' 'সে কোথায়'
ক্লান্তচরণে আমারি দুয়ারে নামি—
শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,
'শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

ফাগুনযামিনী, প্রদীপ জ্বলিছে ঘরে—
দখিন-বাতাস মরিছে বুকের 'পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ার-সমুখে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ,
অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি
দূর্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি বিজন রাজপথ-পানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধুলায় নামি—

ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

মার্জনা

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভালোবেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
ভীরু পাখির মতন তব পিঞ্জরে এসেছি,
ওগো, তাই বলে দ্বার কোরো না রুদ্ধ কোরো না।
মোর যাহা-কিছু ছিল কিছুই পারি নি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখো ঢাকো, তুমি করো মোরে করুণা—
ওগো, আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালোবাসিতে
তবু ভালোবাসা কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি-কণা হাসিতে
এই অসহায়া-পানে চেয়ো না বন্ধু, চেয়ো না।
আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত শরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু হাতে ঢাকিব নগ্নহৃদয়বেদনা—
ওগো, প্রিয়তম, তুমি অভাগীরে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

ওগো প্রিয়তম, যদি চাহ মোরে ভালোবাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।
যবে সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া
তুমি দূর হতে বসি হেসো না গো সখা, হেসো না।

যবে রানীর মতন বসিব রতন-আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড়প্রণয়শাসনে,
যবে দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা,
ওগো, তখন, হে নাথ, গরবিরে কোরো মার্জনা কোরো মার্জনা।

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

লীলা

কেন বাজাও কাঁকন কনকন, কত ছলভরে!
ওগো, ঘরে ফিরে চলো কনককলসে জল ভ'রে।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা।
কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে কার তরে
কত ছলভরে!

হেরো যমুনাবেলায় আলসে হেলায় গেল বেলা,
যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি কলস্বরে
কত ছলভরে!
হেরো নদীপরপারে গগনকিনারে মেঘমেলা,
তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি মুখ-'পরে
কত ছলভরে!

শরৎ ১৩০৪

যাচনা

ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো— তোমার
মনের মন্দিরে।

আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো— তোমার
চরণমঞ্জীরে।

ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখিটি— তোমার
প্রাসাদপ্রাঙ্গণে।
মনে ক'রে, সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখীটি— তোমার
কনককঙ্কণে।

আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো— তোমার
অলকবন্ধনে।
আমার স্মরণশুভসিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো— তোমার
ললাটচন্দনে।

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো গো— তোমার
অঙ্গসৌরভে।
আমার আকুল জীবনমরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো গো— তোমার
অতুল গৌরবে।

৮ আশ্বিন ১৩০৪

মানসপ্রতিমা

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্তসুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্যগগনবিহারী!
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীমগগনবিহারী!

মম হৃদয়রক্তরঞ্জনে তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যাস্বপনবিহারী!
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে
মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজনজীবনবিহারী!

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধনয়নবিহারী!
মম সংগীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম জীবনমরণবিহারী!

৯ আশ্বিন ১৩০৪

প্রার্থী

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা
তব নব প্রভাতের নবীন শিশির-ঢালা।
শরমে জড়িত কত-না গোলাপ কত-না গরবী করবী
কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

অমল শরতশীতল সমীর বহিছে তোমার কেশে,
কিশোর অরুণ কিরণ তোমার অধরে পড়েছে এসে।
অঞ্চল হতে বনপথে ফুল যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া—
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

১০ আশ্বিন ১৩০৪

সকরুণা

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।
যদি শুধায় কে দিল কোন্ ফুলকাননে,
তোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে।
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!

সখী, তরুর তলায় বসে সে ধুলায় যে!
সেথা বকুলমালায় আসন বিছায়ে দে।
সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে—
কেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে?
সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে!

১০ আশ্বিন ১৩০৪

ভিখারী

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কী তোমার চাই ?
ওগো ভিখারী আমার ভিখারী, চলেছ
কী কাতর গান গাই' !
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে—
ভিখারী আমার ভিখারী,
হায় পলকে সকলই সঁপেছি চরণে,
আর তো কিছুই নাই ।
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস ।
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পুরাতে আশ ।
হেরো মম প্রাণ মন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব—
ভিখারী আমার ভিখারী,
হায় আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই ।

১২ আশ্বিন ১৩০৪

প্রকাশ

হাজার হাজার বছর কেটেছে, কেহ তো কহে নি কথা,
ভ্রমর ফিরেছে মাধবীকুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা ;
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে,
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে ;

ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি,
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি—
এত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে,
সে কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে!

না জানি সে কবি জগতের কোণে কোথা ছিল দিবানিশি,
লতাপাতা চাঁদ মেঘের সহিতে এক হয়ে ছিল মিশি!
ফুলের মতন ছিল সে মৌন মনের আড়ালে ঢাকা,
চাঁদের মতন চাহিতে জানিত নয়ন স্বপনমাখা;
বায়ুর মতন পারিত ফিরিতে অলক্ষ্য মনোরথে
ভাবনা-সাধনা-বেদনা-বিহীন বিফল ভ্রমণপথে—
মেঘের মতন আপনার মাঝে ঘনায়ে আপন ছায়া
একা বসি কোণে জানিত রচিতে ঘনগম্ভীর মায়া।

দ্যুলোকে ভূলোকে ভাবে নাই কেহ আছে সে কিসের খোঁজে—
হেন সংশয় ছিল না কাহারো সে যে কোনো কথা বোঝে।
বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে তাই ছিল নাকো সাবধানে,
ঘন ঘন তার ঘোমটা খসিত ভাবে ইঙ্গিতে গানে;
বাসরঘরের বাতায়ন যদি খুলিয়া যাইত কভু
দ্বারপাশে তারে বসিতে দেখিয়া রুধিয়া দিত না তবু—
যদি সে নিভৃত শয়নের পানে চাহিত নয়ন তুলি
শিয়রের দীপ নিবাইতে কেহ ছুঁড়িত না ফুলধূলি।

শশী যবে নিত নয়নে নয়নে কুমুদীর ভালোবাসা
এরে দেখি হেসে ভাবিত, এ লোক জানে না চোখের ভাষা।
নলিনী যখন খুলিত পরান চাহি তপনের পানে
ভাবিত, এ জন ফুলগন্ধের অর্থ কিছু না জানে।
তড়িৎ যখন চকিত নিমেষে পালাত চুমিয়া মেঘে

ভাবিত, এ খ্যাপা কেমনে বুঝিবে কী আছে অগ্নিবেগে!
সহকারশাখে কাঁপিতে কাঁপিতে ভাবিত মালতীলতা,
'আমি জানি আর তরু জানে শুধু কলমর্মরকথা।'

একদা ফাগুনে সন্ধ্যাসময়ে সূর্য নিতেছে ছুটি,
পূর্বগগনে পূর্ণিমাচাঁদ করিতেছে উঠি-উঠি;
কোনো পুরনারী তরু-আলবালে জল সেচিবার ভানে
ছল ক'রে শাখে আঁচল বাধায়ে ফিরে চায় পিছু-পানে;
কোনো সাহসিকা দুলিছে দোলায় হাসির বিজুলি হানি,
না চাহে নামিতে, না চাহে থামিতে, না মানে বিনয়বাণী;
কোনো মায়াবিনী মৃগশিশুটিরে তৃণ দেয় একমনে,
পাশে কে দাঁড়ায়ে চিনেও তাহারে চাহে না চোখের কোণে—

হেনকালে কবি গাহিয়া উঠিল, 'নরনারী, শুন সবে
কত কাল ধরে কী যে রহস্য ঘটিছে নিখিল ভবে।
এ কথা কে কবে স্বপনে জানিত আকাশের চাঁদ চাহি
পাণ্ডুকপোল কুমুদীর চোখে সারা রাত নিদ নাহি!
উদয়-অচলে অরুণ উঠিলে কমল ফুটে যে জলে
এতকাল ধরে তাহার তত্ত্ব ছাপা ছিল কোন্ ছলে!
এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
বড়ো বড়ো যত পণ্ডিত জনা বুঝিল না তার মানে!'

শুনিয়া তপন অস্তে নামিল শরমে গগন ভরি,
শুনিয়া চন্দ্র থমকি রহিল বনের আড়াল ধরি।
শুনে সরোবরে তখনি পদ্ম নয়ন মুদিল ত্বরা—
দখিন-বাতাস বলে গেল তারে, সকলি পড়েছে ধরা।
শুনে ছি-ছি ব'লে শাখা নাড়ি নাড়ি শিহরি উঠিল লতা;
ভাবিল, মুখর এখনি না জানি আরো কী রটাবে কথা!

ভ্রমর কহিল যূথীর সভায়, 'যে ছিল বোবার মতো
পরের কুৎসা রটাবার বেলা তারো মুখ ফোটে কত!'

শুনিয়া তখনি করতালি দিয়ে হেসে উঠে নরনারী—
যে যাহারে চায় ধরিয়া তাহায় দাঁড়াইল সারি সারি।
'হয়েছে প্রমাণ' 'হয়েছে প্রমাণ' হাসিয়া সবাই কহে,
'যে কথা রটেছে একটি বর্ণ বানানো কাহারো নহে।'
বাহুতে বাহুতে বাঁধিয়া কহিল নয়নে নয়নে চাহি,
'আকাশে পাতালে মরতে আজি তো গোপন কিছুই নাহি।'
কহিল হাসিয়া মালা হাতে লয়ে পাশাপাশি কাছাকাছি,
'ত্রিভুবন যদি ধরা পড়ি গেল, তুমি আমি কোথা আছি।'

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪

বসন্ত

অযুত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম ফাল্গুনে
মত্ত কুতূহলী,
প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণদুয়ার
মর্তে এলে চলি,
অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটিরপ্রাঙ্গণে
পীতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্মাদপবনে
মন্দারমঞ্জরী,
দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি
লয়ে বীণাবেণু—
মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি
ছুঁড়ি পুষ্পরেণু।

সখা, সেই অতিদূর সদ্যোজাত আদিমধুমাসে
তরুণ ধরায়
এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের
স্বর্ণমদিরায়
সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্তপ্রবীণ
নব পুষ্পরাজি
বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ তাই লয়ে আজও পুনর্বার
সাজাইলে সাজি।
তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের
বিস্মৃত বারতা,
তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোকলোকান্তের
কান্ত মধুরতা।

তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জবন হতে
উঠিছে উচ্ছ্বাসি
লক্ষ দিনযামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা,
অশ্রু গান হাসি।
যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষাকাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সযত্নসেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্তপত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে কয়টি কথা

তোমার কুসুমগুলি, হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা!
বকুলে-চম্পকে তারা গাঁথা হয়ে নিত্য যাবে চলি
যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি
কুহুকলস্বরে।
অমর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মরনিশ্বাসে—
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

চৈত্র ১৩০৬]

পতিতা

ধন্য তোমারে, হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার!
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
লও ফিরে তব পুরস্কার।
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,
আমি তারই এক বারাঙ্গনা।

সেদিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা,
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।

পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে
পূর্ব-অচলে উষার মতো—
তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা,
জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎ শত।
মনে হল মোর নবজনমের
উদয়শৈল উজল করি
শিশিরধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি।

তরুণীরা মিলি তরণী বাহিয়া
পঞ্চম স্বরে ধরিল গান—
ঋষির কুমার মোহিত চকিত
মৃগশিশুসম পাতিল কান।
সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে,
মুনিবালকেরে ফেলিল ফাঁদে,
ভুজে ভুজে বাঁধি ঘিরিয়া ঘিরিয়া
নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।
নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
নদীজলতলে বাজিল শিলা—
ভগবান ভানু রক্তনয়নে
হেরিল নিলাজ নিঠুর লীলা।

প্রথমে চকিত দেবশিশুসম
চাহিলা কুমার কৌতুহলে—
কোথা হতে যেন অজানা আলোক
পড়িল তাঁহার পথের তলে।
দেখিতে দেখিতে ভক্তিকিরণ
দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে—

দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ
হেরিলেন আজি প্রভাতকালে।
বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি —
বন্দনাগান রচিলা কুমার
জোড় করি করকমল-দুটি।

করুণ কিশোর কোকিল কণ্ঠে
সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তিমগন
পাতায় পাতায় শিহরি উঠে।
যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর
হয় নি রচিত নারীর তরে।
সে শুধু শুনেছে নির্মলা উষা
নির্জন গিরিশিখর-'পরে।
সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা
নীলনির্বাক্ সিন্ধুতলে।
শুনে গলে যায় আর্দ্র হৃদয়
শিশিরশীতল অশ্রুজলে।

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
অঞ্চলতল অধরে চাপি।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক,
ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি।
ব্যথিত-চিত্তে ত্বরিত-চরণে
করজোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি—
কহিনু, 'হে মোর প্রভু তপোধন,
চরণে আগত অধম দাসী।'

তীরে লয়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ
মুছানু আপন পট্টবাসে—
জানু পাতি বসি যুগল চরণ
মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে।
তার পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু
ঊর্ধ্বমুখীন ফুলের মতো—
তাপসকুমার চাহিলা আমার
মুখপানে করি বদন নত।

প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয়ভেরী।
ধন্য রে আমি, ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমারে রমণী করি।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।
জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
কুমারীর নবনীরব প্রীতি
আমার হৃদয়বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি।
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
'কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা!
তোমার পরশ অমৃতসরস,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা!'

মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি—

তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
শুনি নি এমন সত্যবাণী।
দেবতারে মোর কেহ তো চাহে নি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা—
দূরদুর্গম মনোবনবাসে
পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা।
সেইখানে এল আমার তাপস—
সেই পথহীন বিজন গেহ—
স্তব্ধ নীরব গহন গভীর
যেথা কোনোদিন আসে নি কেহ।
সাধকবিহীন একক দেবতা
ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে
পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে।
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
জাগে আনন্দ ভকতপ্রাণে—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে।

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
'আনন্দময়ী মুরতি তুমি—
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।'
শুনি সে বচন হেরি সে নয়ন
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি—
নিমেষে ধৌত নির্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।

প্রভাত-অরুণ ভায়ের মতন
সঁপি দিল কর আমার কেশে,
আপনার করি নিল পলকেই
মোরে তপোবনপবন এসে।

মিথ্যা তোমার জটিল বুদ্ধি—
বৃদ্ধ, তোমার হাসিরে ধিক্।
চিত্ত তাহার আপনার কথা
আপন মর্মে ফিরায়ে নিক।
তোমার পামরী পাপিনীর দল
খলখল করি হাসিল হাসি—
আবেশে বিলাসে ছলনার পাশে
চারি দিক হতে ঘেরিল আসি।
বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে,
বেণী খসি পড়ে কবরী টুটি—
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে
লীলায়িত করি হস্ত দুটি।

হে মোর অমল কিশোর তাপস,
কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি।
আমার কাতর অন্তর দিয়ে
ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি।
হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি দিতাম টানি
উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত শরমখানি।
ও আহুতি তুমি নিয়ো না, নিয়ো না,
হে মোর অনল, তপের নিধি—

আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি!
ধিক্ রমণীরে, ধিক্ শতবার,
হতলাজ বিধি তোমারে ধিক্!
রমণীজাতির ধিক্কারগানে
ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক।

ব্যাকুল শরমে অসহ ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্ন লতিকাসমা
কহিনু তাপসে, 'পুণ্যচরিত,
পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা।
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো,
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি!'
হরিণীর মতো ছুটে চলে এনু
শরমের শর মর্মে বিঁধি।

ফেলি দিল ফুল মাথায় আমার
তপোবনতরু করুণা মানি,
দূর হতে কানে বাজিতে লাগিল
বাঁশির মতন মধুর বাণী—
'আনন্দময়ী মূরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃতসরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা!'

দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
সরল নয়ন করে নি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল।
তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।

৯ কার্তিক ১৩০৪

অভিসার

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে একদা ছিলেন সুপ্ত—
নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণগগনে ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ সহসা বাজিল বক্ষে।
সন্ন্যাসীবর চমকি জাগিল,
স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল,
রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

নগরীর নটী চলে অভিসারে যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীলবরন,
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ ;
সন্ন্যাসী-গায়ে পড়িতে চরণ থামিল বাসবদত্তা।

প্রদীপ ধরিয়া হেরিল তাঁহার নবীন গৌরকান্তি—
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।

কহিল রমণী ললিত কণ্ঠে, নয়নে জড়িত লজ্জা,
"ক্ষমা করো মোরে, কুমার কিশোর—
দয়া কর যদি গৃহে চলো মোর,
এ ধরণীতল কঠিন কঠোর— এ নহে তোমার শয্যা।"

সন্ন্যাসী কহে করুণ বচনে, "অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে,
এখনো আমার সময় হয় নি,
যেথায় চলেছ যাও তুমি ধনী,
সময় যেদিন আসিবে আপনি যাইব তোমার কুঞ্জে।"

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎশিখায় মেলিল বিপুল আস্য।
রমণী কাঁপিয়া উঠিল তরাসে,
প্রলয়শঙ্খ বাজিল বাতাসে,
আকাশে বজ্র ঘোর পরিহাসে হাসিল অট্টহাস্য।

...

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ, এসেছে চৈত্রসন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল,
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল,
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল পারুল রজনীগন্ধা।

অতি দূর হতে আসিছে পবনে বাঁশির মদির মন্দ্র।
জনহীন পুরী, পুরবাসী সবে

গেছে মধুবনে ফুল-উৎসবে,
শূন্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র।

নির্জন পথে জ্যোৎস্না আলোতে সন্ন্যাসী একা যাত্রী।
মাথার উপরে তরুবীথিকার
কোকিল কুহরি উঠে বার বার—
এত দিন পরে এসেছে কি তাঁর আজি অভিসাররাত্রি।

নগর ছাড়ায়ে গেলেন দণ্ডী বাহির-প্রাচীর-প্রান্তে।
দাঁড়ালেন আসি পরিখার পারে—
আম্রবনের ছায়ার আঁধারে
কে ওই রমণী প'ড়ে এক ধারে তাঁহার চরণোপান্তে।

নিদারুণ রোগে মারীগুটিকায় ভরে গেছে তার অঙ্গ।
রোগমসী-ঢালা কালী তনু তার
লয়ে প্রজাগণে পুরপরিখার
বাহিরে ফেলেছে করি পরিহার বিষাক্ত তার সঙ্গ।

সন্ন্যাসী বসি আড়ষ্ট শির তুলি নিল নিজ অঙ্কে।
ঢালি দিল জল শুষ্ক অধরে,
মন্ত্র পড়িয়া দিল শির-'পরে,
লেপি দিল দেহ আপনার করে শীতচন্দনপঙ্কে।

ঝরিছে মুকুল, কূজিছে কোকিল, যামিনী জোছনামত্তা।
"কে এসেছ তুমি ওগো দয়াময়"
শুধাইল নারী। সন্ন্যাসী কয়,
"আজি রজনীতে হয়েছে সময়, এসেছি বাসবদত্তা!"

১৯ আশ্বিন ১৩০৬

পরিশোধ

“রাজকোষ হতে চুরি! ধরে আন্ চোর,
নহিলে, নগরপাল, রক্ষা নাহি তোর—
মুণ্ড রহিবে না দেহে!” রাজার শাসনে
রক্ষীদল পথে পথে ভবনে ভবনে
চোর খুঁজে খুঁজে ফিরে। নগর-বাহিরে
ছিল শুয়ে বজ্রসেন বিদীর্ণ মন্দিরে
বিদেশী বণিক পান্থ, তক্ষশীলাবাসী;
অশ্ব বেচিবার তরে এসেছিল কাশী,
দস্যুহস্তে খোওয়াইয়া নিঃস্ব রিক্ত শেষে
ফিরিয়া চলিতেছিল আপনার দেশে
নিরাশ্বাসে। তাহারে ধরিল চোর বলি;
হস্তে পদে বাঁধি তার লোহার শিকলি
লইয়া চলিল বন্দীশালে।

সেই ক্ষণে
সুন্দরীপ্রধানা শ্যামা বসি বাতায়নে
প্রহর যাপিতেছিল আলস্যে কৌতুকে
পথের প্রবাহ হেরি— নয়নসম্মুখে
স্বপ্নসম লোকযাত্রা। সহসা শিহরি
কাঁপিয়া কহিল শ্যামা, “আহা, মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে! শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি—
শ্যামা ডাকিতেছে তারে; বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন এ ক্ষুদ্র আলয়ে

দয়া করি।" শ্যামার নামের মন্ত্রগুণে
উতলা নগররক্ষী আমন্ত্রণ শুনে
রোমাঞ্চিত ; সত্বর পশিল গৃহ-মাঝে,
পিছে বন্দী বজ্রসেন নতশির লাজে
আরক্তকপোল। কহে রক্ষী হাস্যভরে,
"অতিশয় অসময়ে অভাজন-'পরে
অযাচিত অনুগ্রহ। চলেছি সম্প্রতি
রাজকার্যে— সুদর্শনে, দেহো অনুমতি।"
বজ্রসেন তুলি শির সহসা কহিলা,
"একি লীলা হে সুন্দরী, একি তব লীলা!
পথ হতে ঘরে আনি কিসের কৌতুকে
নির্দোষ এ প্রবাসীর অবমানদুখে
করিতেছ অবমান!" শুনি শ্যামা কহে,
"হায় গো বিদেশী পান্থ, কৌতুক এ নহে।
আমার অঙ্গেতে যত স্বর্ণ-অলংকার
সমস্ত সঁপিয়া দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।"
এত বলি সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া
বিদেশীর অঙ্গ হতে। কহিল রক্ষীরে,
"আমার যা আছে লয়ে নির্দোষ বন্দীরে
মুক্ত করে দিয়ে যাও।" কহিল প্রহরী,
"তব অনুনয় আজি ঠেলিনু সুন্দরী,
এত এ অসাধ্য কাজ। হৃত রাজকোষ,
বিনা কারো প্রাণপাতে নৃপতির রোষ
শান্তি মানিবে না।" ধরি প্রহরীর হাত
কাতরে কহিল শ্যামা, "শুধু দুটি রাত

বন্দীরে বাঁচায়ে রেখো, এ মিনতি করি।"
"রাখিব তোমার কথা" কহিল প্রহরী।

দ্বিতীয় রাত্রির শেষে খুলি বন্দীশালা
রমণী পশিল কক্ষে, হাতে দীপ জ্বালা,
লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা যেথা বজ্রসেন
মৃত্যুর প্রভাত চেয়ে মৌনী জপিছেন
ইষ্টনাম। রমণীর কটাক্ষ-ইঙ্গিতে
রক্ষী আসি খুলি দিল শৃঙ্খল চকিতে।
বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে বন্দী নিরখিল
সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল
অপরূপ মুখ। কহিল গদ্‌গদস্বরে,
"বিকারের বিভীষিকা-রজনীর পরে
করধৃত-শুকতারা শুভ্র-উষা-সম
কে তুমি উদিলে আসি কারাকক্ষে মম—
মুমূর্ষুর প্রাণরূপা, মুক্তিরূপা অয়ি,
নিষ্ঠুরনগরী-মাঝে লক্ষ্মী দয়াময়ী ?"
"আমি দয়াময়ী !"— রমণীর উচ্চহাসে
চকিতে উঠিল জাগি নব ভয়ত্রাসে
ভয়ংকর কারাগার। হাসিতে হাসিতে
উন্মত্ত উৎকট হাস্য শোকাশ্রুরাশিতে
শতধা পড়িল ভাঙি। কাঁদিয়া কহিলা,
"এ পুরীর পথমাঝে যত আছে শিলা,
কঠিন শ্যামার মতো কেহ নাহি আর।"
এত বলি দৃঢ়বলে ধরি হস্ত তার
বজ্রসেনে লয়ে গেল কারার বাহিরে।

তখন জাগিছে উষা বরুণার তীরে
পূর্ববনান্তরে ; ঘাটে বাঁধা আছে তরী।

"হে বিদেশী, এসো এসো" কহিল সুন্দরী
দাঁড়ায়ে নৌকার 'পরে, "হে আমার প্রিয়,
শুধু এই কথা মোর স্মরণে রাখিয়ো,
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
সকল বন্ধন টুটি হে হৃদয়স্বামী,
জীবনমরণপ্রভু।" নৌকা দিল খুলি।
দুই তীরে বনে বনে গাহে পাখিগুলি
আনন্দ-উৎসবগান। প্রেয়সীর মুখ
দুই বাহু দিয়া তুলি ভরি নিজ বুক
বজ্রসেন শুধাইল, "কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
সম্পূর্ণ জানিতে চাহি অয়ি বিদেশিনী,
এ দীনদরিদ্রজন তব কাছে ঋণী
কত ঋণে।" আলিঙ্গন ঘনতর করি
"সে কথা এখন নহে" কহিল সুন্দরী।

নৌকা ভেসে চলে যায় পূর্ণবায়ুভরে
তূর্ণ স্রোতোবেগে। মধ্যগগনের 'পরে
উদিল প্রচণ্ড সূর্য। গ্রামবধূগণ
গৃহে ফিরে গেছে করি স্নান সমাপন
সিক্তবস্ত্রে, কাংস্যঘটে লয়ে গঙ্গাজল।
ভেঙে গেছে প্রভাতের হাট; কোলাহল
থেমে গেছে দুই তীরে, জনপদ-বাট
পান্থহীন। বটতলে পাষাণের ঘাট,
সেথায় বাঁধিল নৌকা স্নানাহার-তরে
কর্ণধার। তন্দ্রাঘন বটশাখা-'পরে
ছায়ামগ্ন পক্ষীনীড় গীতশব্দহীন;
অলস পতঙ্গ শুধু গুঞ্জে দীর্ঘ দিন;

পক্বশস্যগন্ধহরা মধ্যাহ্নের বায়ে
শ্যামার ঘোমটা যবে ফেলিল খসায়ে
অকস্মাৎ পরিপূর্ণ প্রণয়পীড়ায়
ব্যথিত ব্যাকুল বক্ষ, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়
বজ্রসেন কানে কানে কহিল শ্যামারে,
"ক্ষণিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আমারে,
বাঁধিয়াছ অনন্ত শৃঙ্খলে। কী করিয়া
সাধিলে দুঃসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
মোর লাগি কী করেছ জানি যদি প্রিয়ে,
পরিশোধ দিব তাহা এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ।" বস্ত্র টানি মুখোপরি
"সে কথা এখনো নহে" কহিল সুন্দরী।

গুটায়ে সোনার পাল সুদূরে নীরবে
দিনের আলোকতরী চলি গেল যবে
অস্ত-অচলের ঘাটে, তীর-উপবনে
লাগিল শ্যামার নৌকা সন্ধ্যার পবনে।

শুক্লচতুর্থীর চন্দ্র অস্তগতপ্রায়—
নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে সুদীর্ঘ রেখায়
ঝিকিমিকি করে ক্ষীণ আলো; ঝিল্লিস্বনে
তরুমূল-অন্ধকার কাঁপিছে সঘনে
বীণার তন্ত্রীর মতো। প্রদীপ নিবায়ে
তরীবাতায়নতলে দক্ষিণের বায়ে
ঘননিশ্বসিতমুখে যুবকের কাঁধে
হেলিয়া বসেছে শ্যামা; পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম।

কহিল অস্ফুটকণ্ঠে শ্যামা, "প্রিয়তম,
তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
সুকঠিন, তারো চেয়ে সুকঠিন আজ
সে কথা তোমারে বলা। সংক্ষেপে সে কব ;
একবার শুনে মাত্র মন হতে তব
সে কাহিনী মুছে ফেলো— বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ। এ জীবনে মম
সর্বাধিক পাপ মোর, ওগো সর্বোত্তম,
করেছি তোমার লাগি এ মোর গৌরব।"

ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত গেল। অরণ্য নীরব
শত শত বিহঙ্গের সুপ্তি বহি শিরে
দাঁড়ায়ে রহিল স্তব্ধ। অতি ধীরে ধীরে
রমণীর কটি হতে প্রিয়বাহুডোর
শিথিল পড়িল খসে ; বিচ্ছেদ কঠোর
নিঃশব্দে বসিল দোঁহামাঝে ; বাক্যহীন
বজ্রসেন চেয়ে রহে আড়ষ্ট কঠিন
পাষাণপুত্তলি— মাথা রাখি তার পায়ে
ছিন্নলতাসম শ্যামা পড়িল লুটায়ে
আলিঙ্গনচ্যুতা। মসীকৃষ্ণ নদীনীরে
তীরের তিমিরপুঞ্জ ঘনাইল ধীরে।

সহসা যুবার জানু সবলে বাঁধিয়া
বাহুপাশে, আর্ত নারী উঠিল কাঁদিয়া
অশ্রুহারা শুষ্ককণ্ঠে, "ক্ষমা করো নাথ,
এ পাপের যাহা দণ্ড সে অভিসম্পাত

হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর—
তোমা লাগি যা করেছি তুমি ক্ষমা করো।"
চরণ কাড়িয়া লয়ে চাহি তার পানে
বজ্রসেন বলি উঠে, "আমার এ প্রাণে
তোমার কী কাজ ছিল। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্কৃত। কলঙ্কিনী,
ধিক্ এ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী !
ধিক্ এ নিমেষপাত প্রত্যেক নিমেষে !"

এত বলি উঠিল সবলে। নিরুদ্দেশে
নৌকা ছাড়ি চলি গেলা তীরে, অন্ধকারে
বনমাঝে। শুষ্কপত্ররাশি পদভারে
শব্দ করি অরণ্যেরে করিল চকিত
প্রতি ক্ষণে। ঘন গুল্মগন্ধ পুঞ্জীকৃত
বায়ুশূন্য বনতলে ; তরুকাণ্ডগুলি
চারি দিকে আঁকাবাঁকা নানা শাখা তুলি
অন্ধকারে ধরিয়াছে অসংখ্য আকার
বিকৃত বিরূপ। রুদ্ধ হল চারি ধার ;
নিস্তব্ধনিষেধসম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন। শ্রান্ত কলেবর
পথিক বসিল ভূমে।

কে তার পশ্চাতে
দাঁড়াইল উপচ্ছায়াসম। সাথে সাথে
অন্ধকারে পদে পদে তারে অনুসরি
আসিয়াছে দীর্ঘ পথ মৌনী অনুচরী
রক্তসিক্তপদে। দুই মুষ্টি বদ্ধ ক'রে
গর্জিল পথিক, "তবু ছাড়িবি না মোরে ?"

রমণী বিদ্যুৎ-বেগে ছুটিয়া পড়িয়া
বন্যার তরঙ্গ-সম দিল আবরিয়া
আলিঙ্গনে কেশপাশে স্রস্তবেশবাসে
আঘ্রাণে চুম্বনে স্পর্শে সঘননিশ্বাসে
সর্ব অঙ্গ তার ; আর্দ্রগদ্গদবচনা
কণ্ঠরুদ্ধপ্রায় “ছাড়িব না— ছাড়িব না”
কহে বারম্বার, “তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি শাস্তি দাও মোরে, করো মর্মঘাত—
শেষ করে দাও মোর দণ্ড পুরস্কার।”
অরণ্যের গ্রহতারাহীন অন্ধকার
অন্ধভাবে কী যেন করিল অনুভব
বিভীষিকা। লক্ষ লক্ষ তরুমূল সব
মাটির ভিতরে থাকি শিহরিল ত্রাসে।
বারেক ধ্বনিল রুদ্ধ নিষ্পেষিত শ্বাসে
অন্তিম কাকুতিস্বর ; তারি পরক্ষণে
কে পড়িল ভূমি-'পরে অসাড় পতনে।

বজ্রসেন বন হতে ফিরিল যখন,
প্রথম উষার করে বিদ্যুৎ-বরন
মন্দিরত্রিশূলচূড়া জাহ্নবীর পারে।
জনহীন বালুতটে নদীধারে-ধারে
কাটাইল দীর্ঘ দিন ক্ষিপ্তের মতন
উদাসীন। মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত তপন
হানিল সর্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা।
ঘটকক্ষে গ্রামবধূ হেরি তার দশা
কহিল করুণ কণ্ঠে, “কে গো গৃহছাড়া,
এসো আমাদের ঘরে।” দিল না সে সাড়া।
তৃষায় ফাটিল ছাতি, তবু স্পর্শিল না

সম্মুখের নদী হতে জল এক কণা।
দিনশেষে জ্বরতপ্ত দগ্ধ কলেবরে
ছুটিয়া পশিল গিয়া তরণীর 'পরে,
পতঙ্গ যেমন বেগে অগ্নি দেখে ধায়
উগ্র আগ্রহের ভরে। হেরিল শয্যায়
একটি নূপুর আছে পড়ি ; শতবার
রাখিল বক্ষেতে চাপি, ঝংকার তাহার
শতমুখ শর-সম লাগিল বর্ষিতে
হৃদয়ের মাঝে। ছিল পড়ি এক ভিতে
নীলাম্বর বস্ত্রখানি ; রাশীকৃত করি
তারি-'পরে মুখ রাখি রহিল সে পড়ি—
সুকুমার দেহগন্ধ নিশ্বাসে নিঃশেষে
লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে।

শুক্লপঞ্চমীর শশী অস্তাচলগামী
সপ্তপর্ণতরুশিরে পড়িয়াছে নামি
শাখা-অন্তরালে। দুই বাহু প্রসারিয়া
ডাকিতেছে বজ্রসেন "এসো এসো প্রিয়া"
চাহি অরণ্যের পানে। হেনকালে তীরে
বালুতটে ঘনকৃষ্ণ বনের তিমিরে
কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়াসম।
"এসো এসো প্রিয়া!"— "আসিয়াছি প্রিয়তম"—
চরণে পড়িল শ্যামা, "ক্ষম মোরে ক্ষম।
গেল না তো সুকঠিন এ পরান মম
তোমার করুণ করে।" শুধু ক্ষণতরে
বজ্রসেন তাকাইল তার মুখ'পরে ;
ক্ষণতরে আলিঙ্গন লাগি বাহু মেলি
চমকি উঠিল, তারে দূরে দিল ঠেলি—

গরজিল, "কেন এলি, কেন ফিরে এলি।"
বক্ষ হতে নূপুর লইয়া দিল ফেলি,
জ্বলন্ত অঙ্গার-সম নীলাম্বরখানি
চরণের কাছ হতে ফেলে দিল টানি।
শয্যা যেন অগ্নিশয্যা, পদতলে থাকি
লাগিল দহিতে তারে। মুদি দুই আঁখি
কহিল ফিরায়ে মুখ, "যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও!"

নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে ; পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল ; তার পরে নামি নদীতীরে
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে,
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষণিকের অপূর্ব স্বপন
নিশার তিমিরমাঝে মিলায় যেমন।

২৩ আশ্বিন ১৩০৬

উদ্‌বোধন

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়, ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদেরই গান গা রে আজি প্রাণ ক্ষণিক দিনের আলোকে।

ফুরায় যা, দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস নেকো কুড়াতে।

বুঝি নাই যাহা চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পুরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে তারি গহ্বর পুরাতে।
যখন যা পাস মিটায়ে নে আশ, ফুরাইলে দিস ফুরাতে।

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন ছুটে যা ঝলকে ঝলকে।
ধরণীর 'পরে শিথিলবাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন—
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন— শিরীষফুলের অলকে।
মর্মরতানে ভরে ওঠ্ গানে শুধু অকারণ পুলকে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭]

যুগল

ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ,
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম,
আজ বসন্তে বিনয় রাখো মম—
বন্ধ করো শ্রীমদ্ভাগবত।
শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে
গীত-গোবিন্দ খোলা হোক-না তবে;
শপথ মম, বোলো না এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ!
একটা দিনের সন্ধি করিয়াছি
বন্ধ আছে যমরাজের সমর—
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মানব নাকো রাজার দারোগারে—
কেল্লা হতে ফৌজ সারে সারে
দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরাছুরি,
বলব, রে ভাই, বেজার কোরো নাকো—
গোল হতেছে, একটু থেমে থাকো,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখো
খ্যাপার মতো কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি!
একটুখানি সরে গিয়ে করো
সঙের মতো সঙিন-ঝমঝমর—
আজকে শুধু এক বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।

বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া, আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়নজলে—
ভাগ্য নামে অতিবর্ষাসম!
এক দিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়োই আনে শেষাশেষি—
জান তো, ভাই, দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম।
ফাগুন মাসে ঘরের টানাটানি,
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর—
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী,
আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।

শাস্ত্র

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে ;
আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।
বনে এত বকুল ফোটে, গেয়ে মরে কোকিল পাখি,
লতাপাতার অন্তরালে বড়ো সরস ঢাকাঢাকি।
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো, সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে ?
এ-সব যারা বোঝে তারা পঞ্চাশতের অনেক নীচে।
 পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে ;
 আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।

ঘরের মধ্যে বকাবকি, নানান মুখে নানা কথা ;
হাজার লোকে নজর পাড়ে, একটুকু নাই বিরলতা।
সময় অল্প, ফুরায় তাও অরসিকের আনাগোনায়,
ঘণ্টা ধরে থাকেন তিনি সৎপ্রসঙ্গ-আলোচনায়।
হতভাগ্য নবীন-যুবা কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই এ কথা সে বিশেষ বোঝে।
 পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে ;
 আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।

আমরা সবাই নব্যকালের সভ্য যুবা অনাচারী
মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে নতুন বিধি করব জারি—
বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে, পয়সাকড়ি করুন জমা,
দেখুন বসে বিষয়পত্র, চালান মামলা-মকদ্দমা ;
ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে যুবারা যাক বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্যসাধন, থাকুক রত কঠিন ব্রতে।
 পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে ;
 আমরা বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।

অপটু

যতবার আজ গাঁথনু মালা পড়ল খসে খসে—
কী জানি কার দোষে।
তুমি হোথায় চোখের কোণে দেখছ বসে বসে।
চোখদুটিরে, প্রিয়ে,
শুধাও শপথ নিয়ে,
আঙুল আমার আকুল হল কাহার দৃষ্টিদোষে।

আজ যে বসে গান শোনাব কথাই নাহি জোটে,
কণ্ঠ নাহি ফোটে।
মধুর হাসি খেলে তোমার চতুর রাঙা ঠোঁটে।
কেন এমন ত্রুটি
বলুক আঁখি দুটি।
কেন আমার রুদ্ধ কণ্ঠে কথাই নাহি ফোটে।

রেখে দিলেম মাল্য বীণা— সন্ধ্যা হয়ে আসে।
ছুটি দাও এ দাসে।
সকল কথা বন্ধ করে বসি পায়ের পাশে।
নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ, প্রিয়ে
এমন কোনো কর্ম দেহো অকর্মণ্য দাসে।

ভীরুতা

গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
মনে মনে হাসবি কি না বুঝব কেমন করে।
আপনি হেসে তাই শুনিয়ে দিয়ে যাই—

ঠাট্টা ক'রে ওড়াই, সখী, নিজের কথাটাই।
হালকা তুমি কর পাছে হালকা করি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

সত্য কথা সরলভাবে শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
অবিশ্বাসে হাসবি কি না বুঝব কেমন করে।
মিথ্যা ছলে তাই শুনিয়ে দিয়ে যাই—
উল্টা করে বলি আমি সহজ কথাটাই।
ব্যর্থ তুমি কর পাছে ব্যর্থ করি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

সোহাগ-ভরা প্রাণের কথা শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই।
সোহাগ ফিরে পাব কি না বুঝব কেমন করে।
কঠিন কথা তাই শুনিয়ে দিয়ে যাই—
গর্বছলে দীর্ঘ করি নিজের কথাটাই।
ব্যথা পাছে না পাও তুমি লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করে নীরব হয়ে রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের 'পরে বুকের কথা উথলে ওঠে পাছে,
অনেক কথা তাই শুনিয়ে দিয়ে যাই—
কথার আড়ে আড়াল থাকে মনের কথাটাই।
তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু জাগিয়ে তুলি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই॥

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই, না আসি তোর কাছে—
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর প্রকাশ হয় রে পাছে,
কেবল এসে তাই দেখা দিয়েই যাই—
স্পর্ধাতলে গোপন করি মনের কথাটাই।
নিত্য তব নেত্রপাতে জ্বালিয়ে রাখি, ভাই,
আপন ব্যথাটাই।

ক্ষতিপূরণ

তোমার তরে সবাই মোরে করছে দোষী
হে প্রেয়সী!
বলছে— কবি তোমার ছবি আঁকছে গানে,
প্রণয়-গীতি গাচ্ছে নিতি তোমার কানে,
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে তুচ্ছ কথা
ঢাকছে শেষে বাংলাদেশে উচ্চ কথা।
তোমার তরে সবাই মোরে করছে দোষী
হে প্রেয়সী!

সে কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে তিলক টানি
এলেম রানী!
ফেলুক মুছি হাস্যশুচি তোমার লোচন
বিশ্বসুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত নিন্দিতেরে
করো রক্ষে শীতল বক্ষে বাহুর ঘেরে।
তাই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে তিলক টানি
এলেম রানী!

আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন্ তোমার কাঁকন-কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়।
আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে
ছিল মনে।

হায় রে কোথা যুদ্ধকথা হৈল গত
স্বপ্নমত।
পুরাণচিত্র বীরচরিত্র অষ্টসর্গ
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড নয়ন-খড়্গ।
রৈল মাত্র দিবারাত্র প্রেমের প্রলাপ,
দিলেন ফেলে ভাবী-কেলে কীর্তিকলাপ।
হায় রে কোথা যুদ্ধকথা হৈল গত
স্বপ্নমত।

সে-সব ক্ষতি -পূরণ প্রতি দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি!
লোকের মনে সিংহাসনে নাইকো দাবি,
তোমার মনোগৃহের কোনো দাও তো চাবি।
মরার পরে চাই নে ওরে অমর হতে,
অমর হব আঁখির তব সুধার স্রোতে।
খ্যাতির ক্ষতি -পূরণ প্রতি দৃষ্টি রাখি
হরিণ-আঁখি!

প্রতিজ্ঞা

আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যেমনি বলুন যিনি।
আমি হব না তাপস, নিশ্চয়, যদি না মেলে তপস্বিনী।
আমি করেছি কঠিন পণ
যদি না মিলে বকুল-বন,
যদি মনের মতন মন না পাই জিনি,
তবে হব না তাপস, হব না, যদি না পাই সে তপস্বিনী।

আমি ত্যজিব না ঘর, হব না বাহির উদাসীন সন্ন্যাসী
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই ভুবন-ভুলানো হাসি।
যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকন-মল রিনিকৃঝিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, যদি না পাই গো তপস্বিনী।

আমি হব না তাপস, তোমার শপথ, যদি সে তপের বলে
কোনো নূতন ভুবন না পারি গড়িতে নূতন হৃদয়তলে।
যদি জাগায়ে বীণার তার
কারো টুটিয়া মরমদ্বার
কোনো নূতন আঁখির ঠার না লই চিনি,
আমি হব না তাপস, হব না, হব না, না পেলে তপস্বিনী॥

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার কহো আমায়, ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের করব মহাজনি।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি, বসিয়ে হাজার দাঁড়ি,
কোন্ নগরে যাব দিয়ে কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি
কূল-কিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী অকূল কালো নীরে।
মরব না আর ব্যর্থ আশায় বালুমরুর তীরে।
যাবই আমি যাবই, ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু আর কারে তো পাবই।

সাগর উঠে তরঙ্গিয়া, বাতাস বহে বেগে,
সূর্য যেথায় অস্তে নামে ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই—
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই—
যদি কোথাও কূল নাহি পাই তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে রইব না আর কভু।
যাবই আমি যাবই, ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু আর কারে তো পাবই।

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,

ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে বইছে নগনদী।
সোনার রেণু আনব ভরি সেথায় নামি যদি।
যাবই আমি যাবই, ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু আর কারে তো পাবই।

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে আমার শূন্য নায়।
নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে অপূর্ব ধন যত।
ভিখারী তোর ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো।
যাবই আমি যাবই, ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু আর কারে তো পাবই।

দুই বোন

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে।
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে।
ছায়ায় নিবিড় বনে যে আছে আঁধার কোণে
তারে যে কখন্ কটাক্ষে চায়
কিছু তো পারি নে জানতে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে।

দুটি বোন তারা করে কানাকানি
কী না জানি জল্পনা!

গুঞ্জনধ্বনি দূর হতে শুনি,
কী গোপন মন্ত্রণা!
আসে যবে এইখানে চায় দোঁহে দোঁহা-পানে,
কাহারো মনের কোনো কথা তারা
করেছে কি কল্পনা।
দুটি বোন তারা করে কানাকানি
কী না জানি জল্পনা।

এইখানে এসে ঘট হতে কেন
জল উঠে উচ্ছলি।
চপল চক্ষে তরল তারকা
কেন উঠে উজ্জ্বলি।
যেতে যেতে নদীপথে জেনেছে কি কোনোমতে
কাছে কোথা এক আকুল হৃদয়
দুলে উঠে চঞ্চলি।
এইখানে এসে ঘট হতে জল
কেন উঠে উচ্ছলি।

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে।
বটের ছায়ায় কেহ কি তাদের
পড়েছে চোখের প্রান্তে।
কৌতুকে কেন ধায় সচকিত দ্রুত পায়।
কলসে কাঁকন ঝলকি ঝনকি
ভোলায় রে দিক্‌ভ্রান্তে।
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আনতে।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

নববর্ষা

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ ;
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে।

গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে, গরজে
গগনে।
ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত,
দাদুরি ডাকিছে সঘনে।
গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে
লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।

নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।

ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কবরী
এলায়ে!
ওগো, নবঘন নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি।
তড়িৎশিখার চকিত আলোকে
ওগো, কে ফিরিছে খেলায়ে।
ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে।

ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে অমল বসনে, শ্যামল
বসনে!
সুদূর গগনে কাহারে সে চায়,
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায়।
নবমালতীর কচি দলগুলি
আনমনে কাটে দশনে।
ওগো, নদীকূলে তীরতৃণতলে
কে ব'সে শ্যামল বসনে।

ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে! দোদুল
দুলিছে!

ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে।
ওগো, নির্জনে বকুলশাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে।

বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
কে বেঁধেছে তার তরণী, তরুণ
তরণী।
রাশি রাশি তুলি শৈবালদল
ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল,
বাদলরাগিণী সজলনয়নে
গাহিছে পরানহরণী।
বিকচকেতকী তটভূমি-'পরে
বেঁধেছে তরুণ তরণী।

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয়
নাচে রে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

অবিনয়

হে নিরুপমা,
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে করিয়ো ক্ষমা।
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে—
নবকদম্ব মদিরগন্ধে আকুল করে।

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ করিয়ো ক্ষমা।
হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে মারিছে উঁকি—
বাতাস করিছে দুরন্তপনা ঘরেতে ঢুকি।

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা।
ঝরঝর ধারা আজি উতরোল,
নদীকূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে নবীন পাতা—
সজল পবন দিশে দিশে তুলে বাদলগাথা।

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হতে পারে, করিয়ো ক্ষমা।
দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনোখানে কারো নাহি কোনো কাজ,
জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ যেন সে আঁকা—
বর্ষণঘন শীতল আঁধারে জগৎ ঢাকা।

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা—
তোমারি ললাটে নববরষার বরণডালা।

১ আষাঢ় ১৩০৭

কৃষ্ণকলি

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে
ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু
শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

এমনি করে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশানকোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

৪ আষাঢ় ১৩০৭

শেষ

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ— থাকবে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে কালের পিছু পিছু।
অধিক দিন তো বইতে হয় না শুধু একটি প্রাণ।
অনন্ত কাল একই কবি গায় না একই গান।
মালা বটে শুকিয়ে মরে— যে জন মালা পরে
সেও তো নয় অমর, তবে দুঃখ কিসের তরে।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ— থাকবে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে কালের পিছু পিছু।

সবই হেথায় একটা কোথাও করতে হয় রে শেষ,
গান থামিলে তাই তো কানে থাকে গানের রেশ।
কাটলে বেলা সাধের খেলা সমাপ্ত হয় ব'লে
ভাবনাটি তার মধুর থাকে আকুল অশ্রুজলে।
জীবন অস্তে যায় চলি, তাই রঙটি থাকে লেগে
প্রিয়জনের মনের কোণে শরৎসন্ধ্যামেঘে।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ— থাকবে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে ধেয়ে কালের পিছু পিছু।

ফুল তুলি তাই তাড়াতাড়ি, পাছে ঝ'রেই পড়ে।
সুখ নিয়ে তাই কাড়াকাড়ি, পাছে যায় সে স'রে।
রক্ত নাচে দ্রুতচ্ছন্দে, চক্ষে তড়িৎ ভায়,
চুম্বনেরে কেড়ে নিতে অধর ধেয়ে যায়।
সমস্ত প্রাণ জাগে রে তাই, বক্ষোদোলায় দোলে—
বাসনাতে ঢেউ উঠে যায় মত্ত আকুল রোলে।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ— থাকবে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ছুটে কালের পিছু পিছু।

আজ তোমাদের যেমন জানছি তেমনি জানতে জানতে
ফুরায় যেন সকল জানা— যাই জীবনের প্রান্তে।
এই-যে নেশা লাগল চোখে এইটুকু যেই ছোটে
অমনি যেন সময় আমার বাকি না রয় মোটে!
জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে যায় যদি যাক খুলি,
মর্তে যেন না ভেঙে যায় মিথ্যে মায়াগুলি।
থাকব না ভাই, থাকব না কেউ— থাকবে না, ভাই, কিছু।
সেই আনন্দে চল্ রে ধেয়ে কালের পিছু পিছু।

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকাননমাঝে—
হে কল্যাণী, নিত্য আছ আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে পূজার সাজি ভরি,
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণ-ডালা ধরি।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটি শঙ্খ বাজে,
কাঁকনদুটির মঙ্গলগীত উঠে মধুর স্বরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।

রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা।

ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি হাসে চোখের 'পরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।

তোমার নাহি শীত-বসন্ত জরা কি যৌবন,
সর্বঋতু সর্বকালে তোমার সিংহাসন।
নিভে নাকো প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি চির বিরাজ করে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।

নদীর মতো এসেছিলে গিরিশিখর হতে,
নদীর মতো সাগর-পানে চলো অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল তীর্থসলিল ঝরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।

তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত-যে ফুল কত আকুল মুকুল খ'সে পড়ে।
সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান আছে তোমার তরে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

রমণী

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি—
যে ভাবে সুন্দর তিনি সর্ব চরাচরে,
যে ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে ভাবে লতায় ফুল নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

১ মাঘ ১৩০৯

অসীম মিলন

আজ মনে হয়, সকলেরই মাঝে তোমারেই ভালোবেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধ'রে শুধু তুমি আমি এসেছি।
দেখি চারি দিক -পানে
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে!
তোমার আমার অসীম মিলন যেন গো সকলখানে।
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু সে কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি!

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস সুখের দুখের কাহিনী—
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে কত বা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা দুজনে এসেছি খেলিয়া।

লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা গাঁথ নি কি মোর জীবনে?
সে প্রভাতে কোন্ খানে
জেগেছিনু কেবা জানে!
কী মুরতি-মাঝে ফুটালে আমারে সেদিন লুকায়ে প্রাণে!
হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে গড়িছ নূতন করিয়া—
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর, রবে চিরদিন ধরিয়া।

হে প্রেম হে ধ্রুব সুন্দর

আকাশসিন্ধু-মাঝে এক ঠাঁই কিসের বাতাস লেগেছে,
জগৎ-ঘূর্ণি জেগেছে।

ঝলকি উঠেছে রবিশশাঙ্ক, ঝলকি ছুটেছে তারা,
অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে অবিরাম মাতোয়ারা।
স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল উঠেছে শূন্য-পানে।
সুন্দরী, ওগো সুন্দরী,
শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি!
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে, অচল তোমার রূপরাশি।
নানা দিক হতে নানা দিন দেখি— পাই দেখিবারে ওই হাসি।

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে চলেছি হরণে পূরণে,
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরনে।
কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে চলে যায় সেই দূরে,
হাতে পাই যারে পলক ফেলিতে তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে।
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক, রাখিতে পারি নে কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায় ফেনপুঞ্জের পিছু।
হে প্রেম, হে ধ্রুবসুন্দর,
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ ঘূর্ণার পাকে খরতর।
দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত, ঝরে নির্ঝর কলভাষে—
অসীমের চির-চরমশান্তি নিমেষের মাঝে মনে আসে।

গৃহলক্ষ্মী

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে হে নারী,
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি
আপন চরণপ্রান্তে; তুমি মুগ্ধ চিতে
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সংগীতে।
স্তবে তব নাহি কান— তাই স্তব করি,
তাই আমি ভক্ত তব অনিন্দ্যসুন্দরী!

ভুবন তোমারে পূজে জেনেও জান না ;
ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে। রাজমহিমারে
যে করপরশে তব পার করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত সে সুন্দর করে
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে।
সেই তো মহিমা তব, সেই তো গরিমা—
সকল মাধুর্য চেয়ে তারি মধুরিমা।

নারী

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
তুমি এসো এসো নারী,
আনো তব হেমঝারি।
ধুয়ে-মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন—
সুন্দর করো, সার্থক করো
পুঞ্জিত আয়োজন।
এসো সুন্দরী নারী,
শিরে লয়ে হেমঝারি।

হাটে আর নাই কেহ।
শেষ করে খেলা ছেড়ে এনু মেলা,
গ্রামে গড়িলাম গেহ।
তুমি এসো এসো নারী,
আনো গো তীর্থবারি।

স্নিগ্ধহসিত বদনইন্দু,
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুরবিন্দু,
মঙ্গল করো, সার্থক করো
শূন্য এ মোর গেহ।
এসো কল্যাণী নারী,
বহিয়া তীর্থবারি।

বেলা কত যায় বেড়ে।
কেহ নাহি চাহে খর-রবিদাহে
পরবাসী পথিকেরে।
তুমি এসো এসো নারী,
আনো তব সুধাবারি।
বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক করো
পরবাসী পথিকেরে।
আনন্দময়ী নারী,
আনো তব সুধাবারি।

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা।
এবারের মতো দিন হল গত,
এলো বিদায়ের বেলা!
তুমি এসো এসো নারী,
আনো গো অশ্রুবারি।
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
পথে ক'রে দিক্ করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হোক্ বিদায়ের বেলা।

অয়ি বিষাদিনী নারী,
আনো গো অশ্রুবারি।

আঁধার নিশীথরাতি।
গৃহ নির্জন, শূন্য শয়ন,
জ্বলিছে পূজার বাতি।
তুমি এসো এসো নারী,
আনো তর্পণবারি।
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলোকেশপাশে শুভ্রবসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।
এসো তাপসিনী নারী,
আনো তর্পণবারি।

কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাই নি কিছু, জানাই নি মোর নাম!
তুমি যখন বিদায় নিলে নীরব রহিলাম।

একলা ছিলেম কুয়ার ধারে নিমের ছায়াতলে,
কলস নিয়ে সবাই তখন পাড়ায় গেছে চলে।
আমায় তারা ডেকে গেল, 'আয় গো বেলা যায়।'
কোন্ আলসে রইনু বসে কিসের ভাবনায়!

পদধ্বনি শুনি নাইকো কখন্ তুমি এলে।
কইলে কথা ক্লান্ত কণ্ঠে করুণ চক্ষু মেলে
'তৃষাকাতর পান্থ আমি'— শুনে চম্‌কে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে তোমার করপুটে!

মর্মরিয়া কাঁপে পাতা, কোকিল কোথা ডাকে,
বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে পল্লীপথের বাঁকে।

যখন তুমি শুধালে নাম পেলেম বড়ো লাজ—
তোমার মনে থাকার মতো করেছি কোন্ কাজ!
তোমায় দিতে পেরেছিলেম একটু তৃষার জল,
এই কথাটি আমার মনে রহিল সম্বল।
কুয়ার ধারে দুপুর-বেলা তেমনি ডাকে পাখি,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা— আমি বসেই থাকি।

৯ চৈত্র ১৩১২

ঘাটের পথ

ওরা চলেছে দিঘির ধারে।
ওই শোনা যায় বেণুবনছায়
কঙ্কণঝংকারে।
আমার চুকেছে দিবসের কাজ;
শেষ হয়ে গেছে জল ভরা আজ—
দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।
ওরা চলেছে দিঘির ধারে।

আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
শাখা-থরোথরো পাতা-মরোমরো
ছায়া-সুশীতল বাটে?
বেলা বেশি নাই, দিন হল শোধ—
ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ—
এ বেলা কেমনে কাটে?
আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে?

ওগো, কী আমি কহিব আর !
ভাবিস নে কেহ ভয় করি আমি
ভরা কলসের ভার।
যা হোক তা হোক এই ভালোবাসি—
বহে নিয়ে যাই, ভরে নিয়ে আসি
কত দিন কতবার।
ওগো, আমি কী কহিব আর !

এ কি শুধু জল নিয়ে আসা ?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কী কব, কী আছে ভাষা !
কত-না দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে
কত কাঁদা, কত হাসা।
এ কি শুধু জল নিয়ে আসা !

আমি ডরি নাই ঝড় জল,
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে
উদ্দাম অঞ্চল।
বেণুশাখা-'পরে বারি ঝরোঝরে,
এ কূলে ও কূলে কালো ছায়া পড়ে,
পথঘাট পিচ্ছল।
আমি ডরি নাই ঝড় জল।

আমি গিয়েছি আঁধার সাঁজে।
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
নির্জন বন-মাঝে।

বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে,
ঝিল্লির সাথে ঝমকে ঝমকে
চরণে ভূষণ বাজে।
আমি গিয়েছি আঁধার সাঁঝে।

যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা,
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা,
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছলোছলি
জলভরা কলকথা—
যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা।

ওগো দিনে কতবার ক'রে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ওই পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোতকূজন-করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো, দিনে কতবার ক'রে।

আমি বাহির হইব ব'লে
যেন সারা দিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।
তাই কানাকানি পাতায় পাতায়,
কালো লহরীর মাথায় মাথায়
চঞ্চল আলো দোলে—
আমি বাহির হইব ব'লে!

আজ ভরা হয়ে গেছে বারি।
আঙিনার দ্বারে চাহি পথ-পানে
ঘর ছেড়ে যেতে নারি!
দিনের আলোক ম্লান হয়ে আসে,
বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে
কক্ষে লইয়া ঝারি।
মোর ভরা হয়ে গেছে বারি।

[ভাদ্র ১৩১২]

শুভক্ষণ

ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ-পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে রহিব বলো কী মতে!
বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে কোন্ বরনের বাস।

মা গো, কী হল তোমার, অবাক্ নয়নে মুখ-পানে কেন চাস্?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে।
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ, যাবে সে সুদূর পুরে—
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ-পথে,
শুধু সে নিমেষ-লাগি না করিয়া বেশ রহিব বলো কী মতে!

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ-পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার স্বর্ণশিখর রথে।

ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি, মা, দেখে—
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার পথের ধুলার 'পরে।

মা গো, কী হল তোমার, অবাক্ নয়নে চাহিস কিসের তরে?
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ, ধুলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ-পথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া রহিব বলো কী মতে!

১৩ শ্রাবণ ১৩১২

গোধূলিলগ্ন

আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে গোধূলিলগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে সোনার গগন রে।
শেষ করে দিল পাখি গান গাওয়া,
নদীর উপরে পড়ে এল হাওয়া,
ও পারের তীর ভাঙা মন্দির আঁধারে মগন রে।
আসিছে মধুর ঝিল্লিনূপুরে গোধূলিলগন রে।

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায় কখনো কত কী কাজে!
এখন কী শুনি, পূরবীর সুরে কোন্ দূরে বাঁশি বাজে!
বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে—

বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে নবমিলনের সাজে !
সারা হল কাজ, মিছে কেন আজ ডাকো মোরে আর কাজে !

আমি জানি যে আমার হয়ে গেছে গণা গোধূলিলগন রে।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন অস্তগগন রে—
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে করিবে মগন রে,
সব গান সেরে আসিবে যখন গোধূলিলগন রে !

২৯ পৌষ ১৩১২

বর্ষাসন্ধ্যা

আমায় অমনি খুশি করে রাখো কিছুই না দিয়ে
শুধু তোমার বাহুর ডোরে বাহু বাঁধিয়ে।
এমনি ধূসর মাঠের পারে
এমনি সাঁঝের অন্ধকারে
বাজাও আমার প্রাণের তারে গভীর ঘা দিয়ে।
আমায় অমনি রাখো বন্দী ক'রে কিছুই না দিয়ে।

আমি আপনাকে আজ বিছিয়ে দেব কিছুই না করি
দু হাত মেলে দিয়ে তোমার চরণ পাকড়ি।
আষাঢ়-রাতের সভায় তব
কোনো কথাই নাহি কব,
বুক দিয়ে সব চেপে লব নিখিল আঁকড়ি।
আমি রাতের সাথে মিশিয়ে রব কিছুই না করি।

আজ বাদল-হাওয়ায় কোথা রে জুঁই গন্ধে মেতেছে !
লুপ্ত তারার মালা কে আজ লুকিয়ে গেঁথেছে !
আজি নীরব অভিসারে
কে চলেছে আকাশ-পারে,
কে আজি এই অন্ধকারে শয়ন পেতেছে !
আজ বাদল-হাওয়ায় জুঁই আপনার গন্ধে মেতেছে।

ওগো, আজকে আমি সুখে রব কিছুই না নিয়ে
আপন হতে আপন মনে সুধা ছানিয়ে।
বনে হতে বনান্তরে
ঘন ধারায় বৃষ্টি ঝরে
নিদ্রাবিহীন নয়ন-'পরে স্বপন বানিয়ে।
ওগো, আজকে পরান ভরে লব কিছুই না নিয়ে।

৯ আষাঢ় ১৩১৩। রাত্রি

গীতাঞ্জলি

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।
এসো গন্ধে বরনে, এসো গানে।
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে অমৃতময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু নয়ানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।
এসো দুঃখে সুখে এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে,
এসো সকল কর্ম-অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

অগ্রহায়ণ ১৩১৪ ?

২

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে—
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে।

তুমি যদি না দেখা দাও কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা।

দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে॥

আষাঢ় ১৩১৬

৩

আজি শ্রাবণঘন-গহন-মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।

কূজনহীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে—
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের 'পরে॥
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

আষাঢ় ১৩১৬

৪

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশসম
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার।

শ্রাবণ ১৩১৬

৫

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে,
এখন চল্ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে, ডাকে আমায় পথের 'পরে সেই ধ্বনিতে।
চল্ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।

এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া—
ওরে, প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া।
জানি নে আর ফিরব কি না,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।
চল্ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে।

১৩ ভাদ্র ১৩১৬

৬

এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ,
এই-যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরন।

এই-যে মধুর আলস-ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ-'পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ—
এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ।

প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৭

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর—
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর।
আজিকে এই আকাশ-তলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন ক'রে, মনোহরণ, ছড়ালে মন মোর।

কেমন খেলা হল আমার আজি তোমার সনে।
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই ভেবে না পাই মনে।
আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়ন-জলে,
বিরহ আজ মধুর হয়ে করেছে প্রাণ ভোর।

২৫ আশ্বিন ১৩১৬

৮

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে।
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বরমাঝে
একি চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সংগীত লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে গন্ধবিধুর সমীরণে॥

ওগো জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুলসৌগন্ধে
নব- পল্লবমর্মরছন্দে
চন্দ্রকিরণসুধাসিঞ্চিত অম্বরে অশ্রুসরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে গন্ধবিধুর সমীরণে।

ফাল্গুন ১৩১৬

৯

সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপন-মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী।

জেগে দেখি দখিন হাওয়া পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়,
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তার মালার পরশ বুকে লাগে নি।

১২ বৈশাখ ১৩১৭

১০

কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ কেবলমাত্র গানে গানে।
রাজার পথে লোক ছুটেছে,
বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই দিনদুপুরের মধ্যখানে—
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে কেন যে তা কেই বা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনে মৌমাছিরা বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে
গেছে তো দিন অনেক কেটে,
অলস-বেলার খেলার সাথি এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা-কাজের ডাক পড়েছে কেন যে তা কেই বা জানে।

১৮ চৈত্র ১৩১৮

১১

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তারে রাখতে নারি টানি।
আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা,
তুমি দেখলে আমারে
এমন প্রলয়মাঝে আনি,
আমায় এমন মরণ হানি।

হঠাৎ আকাশ উজলি
কারে খুঁজে কে ওই চলে।

চমক লাগায় বিজলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ-গগন জুড়ে
আমার যাক সকলি উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক আমার প্রাণের বাণী
কোনো বাঁধন নাহি মানি॥

২৮ চৈত্র ১৩১৮

১২

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেকতরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে।

বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে,
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।

২৯ চৈত্র ১৩১৮

১৩

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন-হাওয়া গোপন কথা জানায় কানে কানে।

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে।
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল-হেন,
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার কূল সে নাহি জানে।

২৮ আশ্বিন ১৩২০

১৪

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া
আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া,
হৃদয় আমার আকুল করে সুগন্ধ ধন লুটবে।

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার মতো ধন,
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তারে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব চরণে তার লুটবে।

১৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০

১৫

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা।

চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদি স্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা।

১৫ পৌষ ১৩২০

১৬

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা।
বুকের 'পরে দোলে রে তার পরান-পুতলা।
আনন্দেরই ছবি দোলে
দিগন্তেরই কোলে কোলে,
গান দুলিছে নীলাকাশের হৃদয়-উথলা।

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায় কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা অতলা।

মাঘীপূর্ণিমা ১৩২০

১৭

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন।
তারি গলার মালা হতে পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন।
এল যখন সাড়াটি নাই,
গেল চ'লে জানালো তাই,
এমন করে আমারে হায় কে বা কাঁদায় সে জন ভিন্ন।

তখন তরুণ ছিল অরুণ-আলো, পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত যে রঙিন বেশে ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।
সেদিন খবর মিলল না যে,
রইনু বসে ঘরের মাঝে,
আজকে পথে বাহির হব বহি আমার জীবন জীর্ণ।

১৫ ফাল্গুন ১৩২০

১৮

আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে,
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক তারে।
বাহুপাশের কাঙাল সে যে,
চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে—
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক তারে।

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায় বাজি সুরে,
সেই গানের টানে পার না আর রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখি-সম,
বাহির হয়ে এস তুমি অন্ধকারে—
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাক তারে।

১৬ ফাল্গুন ১৩২০

১৯

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন ক'রে
ফেল আমার মুখের 'পরে,
আপনি থাক আলোর পিছনে।

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কী উৎসবের লগনে—
সব আলো তার কেমন ক'রে
পড়ে তোমার মুখের 'পরে,
আপনি পড়ি আলোর পিছনে।

২০ ফাল্গুন ১৩২০

২০

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে,
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে।
পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে—
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে, দুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।

যে শাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না একেবারে,
তোমার ওই বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবন-হারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা—
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে, ভুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।

২৫ ফাল্গুন ১৩২০

২১

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ওই চেয়ে-দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে।

ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা,
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে।

১৩ চৈত্র ১৩২০

২২

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে;
নহিলে ফুলে কিসের রঙ লেগেছে,
গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে।

দিয়ে দুঃখসুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া,
এলে আমার জীবনে।

১৬ চৈত্র ১৩২০

২৩

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মতো।
তুমি পার হয়ে এসেছ মরু,
নাই যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় এমন ভাগ্যহত।

তখন আলসেতে বসে ছিলেম আমি আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা বাজবে পায়ে পায়ে।
তবু ওই বেদনা আমার বুকে
বেজেছিল গোপন দুখে,
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার গভীর হৃদয়-ক্ষত।

২৪ চৈত্র ১৩২০

২৪

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে এল এল এল গো। ওগো পুরবাসী!
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে এল এল এল গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো।

তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হল সকল গগন,
চিত্ত হল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে এল এল এল গো।
তোমার পরান-প্রদীপ তুলে ধোরো, ওই আলোতে জ্বেলো গো।

৩ বৈশাখ ১৩২১

২৫

তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল।
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।
ওগো ওই তোমারি ফুল!
ওরা আমার হৃদয়-পানে মুখ তুলে যে থাকে।
ওরা তোমার মুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে।
ওগো ওই তোমারি ফুল!
তোমার কাছে কী যে আমি সেই কথাটি হেসে
ওরা আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে, ছড়ায় দেশে দেশে।
ওগো ওই তোমারি ফুল!
দিন কেটে যায় অন্যমনে, ওদের মুখে তবু
প্রভু, তোমার মুখের সোহাগ-বাণী ক্লান্ত না হয় কভু।
ওগো ওই তোমারি ফুল!
প্রাতের পরে প্রাতে ওরা, রাতের পরে রাতে
তোমার অন্তবিহীন যতনখানি বহন করে মাথে।
ওগো ওই তোমারি ফুল!
হাসিমুখে আমার যতন নীরব হয়ে যাচে।
তোমার অনেক যুগের পথ-চাওয়াটি ওদের মুখে আছে।
ওগো ওই তোমারি ফুল!

৬ বৈশাখ ১৩২১

২৬

আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি।
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে।

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা,
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে।

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে।
সব দিতে হবে।

৭ বৈশাখ ১৩২১

২৭

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে, সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর
সুন্দর হে, সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে, সুন্দর॥

এই তোমারি পরশ রাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর
সুন্দর হে, সুন্দর॥

৩১ বৈশাখ ১৩২১

২৮

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে।
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।

গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে যে ওই দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে।
সে যে ওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণ-রূপী জীবন-স্রোতে।
সে যে ওই ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে॥

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

২৯

আমি যে আর সইতে পারি নে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো,
কথা দিয়ে কইতে পারি নে।
হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারি নে।

আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্মরে।

কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারি নে।

৯ ভাদ্র ১৩২১

৩০

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক-না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা।

হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার।
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার ক'রে সারা।

১০ ভাদ্র ১৩২১

৩১

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণ-মাঝে—
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি, ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে॥

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়ু পড়ে থাকে তরুর তলে।

হৃদয়-মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়—
আজি সে তার চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে।

১১ ভাদ্র ১৩২১

৩২

শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে-মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা।
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে-মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।

হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তার যা-কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে—
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয়।
মাঝে-মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো।

১৮ ভাদ্র ১৩২১

৩৩

ও আমার মন, যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে ভাঙল রে ঘুম—
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে॥

মাটির 'পরে আঁচল পাতি
একলা কাটে নিশীথরাতি,
তার বাঁশি বাজে আঁধার-মাঝে— দেখি না যে চক্ষে তারে।

ওরে, তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তারে পায় কি আঁখি।
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে ঘরের বাহির করলি যারে।

২১ ভাদ্র ১৩২১

৩৪

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই।
দেখ্‌ রে চেয়ে আপন-পানে— পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই!
ফিরছে কেঁদে প্রভাত-বাতাস,
আলোক যে তোর ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে শুধায় আজি নীরবে তাই।

কত গোপন আশা নিয়ে কোন্‌ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।
হল না তার ফুটে ওঠা,
কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা,
মর্ত-কাছে স্বর্গ যা চায় সেই মাধুরী কোথা রে পাই!

২ আশ্বিন ১৩২১। অপরাহ্ণ

৩৫

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে।
এই-যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায়
ঝ'রে পড়ে শত লক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।

তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল।

যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে
সংগীতে সে উঠবে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হরবে।

১ আশ্বিন ১৩২১। সন্ধ্যা

৩৬

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-'পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
জীবনে আমার সংগীত দাও আনি,
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণহাতে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

৮ আশ্বিন ১৩২১

৩৭

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে, কে জানে গো।
হৃদয় আমার উদাস ক'রে
কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।

দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো।

১৪ আশ্বিন ১৩২১

উপহার

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান ?
প্রভাতের গান ?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির 'পরে ;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে ?
কী তোমারে দিব আনি ?
সন্ধ্যাদীপখানি ?
এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার ?
হোক ফুল, হোক-না গলার হার,
তার ভার
কেনই বা সবে
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে!

নিজ হতে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি।

তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি—
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,
দেখিবে সহসা
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে—
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে—
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।

বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে, না জানিতে, সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান।

১০ পৌষ ১৩২১

দুই নারী

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—
দু হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশিরস্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ-পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

২০ মাঘ ১৩২১

তুমি-আমি

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ;
এ পার হতে ও পার বেয়ে
বয় নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম—
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।

আমায় তুমি মরণ-মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক ;
আমি এলেম, এল তোমার দুখ ;
আমি এলেম, এল তোমার আগুন-ভরা আনন্দ—
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে—
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয় ;
দেখতে তোমায় বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি, তবু
আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল—
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল।

২৫ মাঘ ১৩২১

প্রেমের বিকাশ

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুশি হয়ে পথের পানে চাও।
খুশি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ-আভাসে।
খুশি তোমার ফাগুন-বনে আকুল হয়ে পড়ে
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।

আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে
তোমার সাগর অধিক ক'রে নাচে
দিনের পরে দিনে।

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

২৭ মাঘ ১৩২১

মানসী

আজ প্রভাতের আকাশটি এই শিশির-ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ওই রৌদ্রে ঝলমল।
এমনি নিবিড় ক'রে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে,
তাই তো আমি জানি—
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল-মানস-সাগর-জলে কমল টলমল।
তাই তো আমি জানি—
আমি বাণীর সাথে বাণী,

আমি গানের সাথে গান,
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা আলোক জ্বলজ্বল।

৭ কার্তিক ১৩২২

নূতন বসন

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখতে কি পায় কেউ?
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহগানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি।

আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজার বার
নূতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে যতন-ভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে দেয় যে তারে আনি।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদন-ভরা শুধু চোখের গানে।
মিলব তখন বিশ্ব-মাঝে আমরা দোঁহে একা,
যেন নূতন দেখা।
তখন আমার অঙ্গ ভরি নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারই আকাশ,
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ।

তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানি,
কখনো জাফ্‌রানি—
আজ তোরা দেখ্‌ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টিধোওয়া আকাশ যেন নবীন আস্‌মানি।

অকূলের এই বর্ণ এ-যে দিশাহারার নীল—
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইছে দূরের হাওয়া
সাগর-পানে-ধাওয়া।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টিভরা ঈশান কোণের নবমেঘের বাণী।

১২ অগ্রহায়ণ ১৩২২

মালা

আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে
সিংহাসনে রানীর হাতে
ছিল সোনার থালা,
তারই 'পরে একটি শুধু ছিল মণির মালা।

কাশী কাঞ্চী কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে
বহুমুখী জনধারার স্রোতে
দলে দলে যাত্রী আসে
ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে।
যারে শুধাই 'কোথায় যাবে', সেই তখনই বলে
'রানীর সভাতলে'।
যারে শুধাই 'কেন যাবে', কয় সে তেজে— চক্ষে দীপ্ত জ্বালা—
'নেব বিজয়-মালা'।

কেউ বা ঘোড়ায় কেউ বা রথে
ছুটে চলে, বিরাম চায় না পথে।

মনে যেন আগুন উঠল ক্ষেপে,
চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেঁপে কেঁপে।
মনে মনে কইনু হর্ষে, 'ওগো জ্যোতির্ময়ী,
তোমার সভায় হব আমি জয়ী।
শূন্য করে থালা
নেব বিজয়-মালা।'

একটি ছিল তরুণ যাত্রী, করুণ তাহার মুখ—
প্রভাত-তারার মতো যে তার নয়ন-দুটি কী লাগি উৎসুক।
সবাই যখন ছুটে চলে
সে যে তরুর তলে
আপন-মনে বসে থাকে।
আকাশ যেন শুধায় তাকে
যার কথা সে ভাবে কী তার নাম!
আমি তারে যখন শুধালাম
'মালার আশায় যাও বুঝি ওই হাতে নিয়ে শূন্য তোমার ডালা',
সে বলে, 'ভাই, চাই নে বিজয়-মালা।'

তারে দেখে সবাই হাসে;
মনে ভাবে, 'এও কেন মোদের সাথে আসে—
আশা করার ভরসাও যার নাইকো মনে,
আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে!'
সবার তরে জায়গা সে দেয় মেলে,
আগে-ভাগে যাবার লাগি ছুটে যায় না আর-সবারে ঠেলে।
কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে;
পথ চলেছে যেন রে কার বাঁশির অধীর ডাকে

হাতে নিয়ে রিক্ত আপন থালা—
তবু বলে চায় না বিজয়-মালা !

সিংহাসনে একলা বসে রানী
মূর্তিমতী বাণী।
ঝঙ্কারিয়া গুঞ্জরিয়া সভার মাঝে
আমার বীণা বাজে।
কখনো বা দীপক রাগে
চমক লাগে,
তারা বৃষ্টি করে ;
কখনো বা মল্লারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে।
আর-সকলে গান শুনিয়ে নতশিরে
সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে ধীরে ধীরে গেছে ঘরে ফিরে।
তারা জানে, যেই ফুরাবে আমার পালা
আমি পাব রানীর বিজয়-মালা।

আমাদের সেই তরুণ সাথি বসে থাকে ধুলায় আসন-তলে ;
কথাটি না বলে।
দৈবে যদি একটি আধটি চাঁপার কলি
পড়ে স্খলি
রানীর আঁচল হতে মাটির 'পরে,
সবার অগোচরে
সেইটি যত্নে নিয়ে তুলে
পরে কর্ণমূলে।
সভাভঙ্গ হবার বেলায় দিনের শেষে
যদি তারে বলি হেসে
'প্রদীপ জ্বালার সময় হল সাঁঝে—
এখনো কি রইবে সভা-মাঝে',

সে হেসে কয়, 'সব সময়েই আমার পালা।
আমি যে, ভাই, চাই নে বিজয়-মালা।'

আষাঢ়-শ্রাবণ অবশেষে গেল ভেসে
ছিন্ন মেঘের পালে
গুরু গুরু মৃদঙ্গ তার বাজিয়ে দিয়ে আমার গানের তালে।
শরৎ এল, শরৎ গেল চলে;
নীল আকাশের কোলে
রৌদ্রজলের কান্নাহাসি হল সারা—
আমার সুরের থরে থরে ছড়িয়ে গেল শিউলি ফুলের ঝারা।
ফাগুন চৈত্র আম-মউলের-সৌরভে-আতুর
দখিন হাওয়ার আঁচল ভরে নিয়ে গেল আমার গানের সুর।
কণ্ঠে আমার একে একে সকল ঋতুর গান
হল অবসান।
তখন রানী আসন হতে উঠে
আমার করপুটে
তুলে দিলেন শূন্য করে থালা
আপন বিজয়-মালা।

পথে যখন বাহির হলেম মালা মাথায় প'রে
মনে হল বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোরে
ঘূর্ণিধুলার মতো।
মানুষ শত শত
ঘিরল আমায় দলে দলে—
কেউ বা কৌতূহলে, কেউ বা স্তুতিচ্ছলে,
কেউ বা গ্লানির পঙ্ক দিতে গায়।
হায় রে হায়,
এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়।

এই ধরণীর লাজুক যত সুখ
ছোটোখাটো আনন্দেরই সরল হাসিটুক
নদীচরের ভীরু হংসদলের মতো
কোথায় হল গত।
আমি মনে মনে ভাবি, 'একি দহন-জ্বালা
আমার বিজয়-মালা!
ওগো রানী, তোমার হাতে আর-কিছু কি নেই?
শুধু কেবল বিজয়-মালা এই?
জীবন আমার জুড়ায় না যে!
বক্ষে বাজে
তোমার মালার ভার—
এই কি পুরস্কার?'

আমার কেমন মনে হল, আরো যেন অনেক আছে বাকি—
সে নইলে সব ফাঁকি।
এ শুধু আধখানা—
কোন্ মানিকের অভাব আছে, এ মালা তাই কানা।
হয় নি পাওয়া সেই কথাটাই কেন মনের মাঝে
এমন করে বাজে!
চল্ রে ফিরে বিড়ম্বিত, আবার ফিরে চল্
দেখবি খুঁজে বিজন সভাতল—
যদি রে তোর ভাগ্যদোষে
ধুলায় কিছু পড়ে থাকে খসে!
যদি সোনার থালা
লুকিয়ে রাখে আর-কোনো এক মালা!

সন্ধ্যাকাশে শান্ত তখন হাওয়া।
দেখি সভার দুয়ার বন্ধ, ক্ষান্ত তখন সকল চাওয়া পাওয়া।

নাই কোলাহল, নাইকো ঠেলাঠেলি,
তরুশ্রেণী স্তব্ধ যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি।
বিজন পথে আঁধার গগনতলে
আমার মালার রতনগুলি আর কি তেমন জ্বলে!
আকাশের ওই তারার কাছে
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে আছে।
দিনের আলোয় ভুলিয়েছিল মুগ্ধ আঁখি,
আঁধারে তার ধরা পড়ল ফাঁকি।
এরই লাগি এত বিবাদ, সারা দিনের এত দুখের পালা?
লও ফিরে লও তোমার বিজয়মালা।

ঘনিয়ে এল রাতি।
হঠাৎ দেখি তারার আলোয় সেই-যে আমার পথের তরুণ সাথি
আপন-মনে
গান গেয়ে যায় রানীর কুঞ্জবনে।
আমি তারে শুধাই ধীরে, 'কোথায় তুমি এই নিভৃতের মাঝে
রয়েছ কোন্ কাজে?'
সে হেসে কয়, 'ফুরিয়ে গেলে সভার পালা,
ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা,
তখন রানীর আসন পড়ে বকুল-বীথিকাতে—
আমি একা বীণা বাজাই রাতে।'
শুধাই তারে, 'কী পেলে তাঁর কাছে?'
সে কয় শুনে, 'এই-যে আমার বুকের মাঝে আলো ক'রে আছে—
কেউ দেখে নি রানীর কোলে পদ্মপাতার ডালা,
তারই মধ্যে গোপন ছিল আপন হাতের গাঁথা বরণ-মালা।'

আষাঢ় ১৩২৫]

তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী-সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায় ?

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্কপত্রে ঘূর্ণবেগে গীতরিক্ত হিমমরুদেশে
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যানমন্ত্রটিরে
আনিল বাহির-তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন পত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।

সেদিন উন্মত্ত তুমি যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে নৃত্যের ছন্দে লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধরে।
ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্নচোখে
নিত্যনূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।

দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা—
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপতরঙ্গিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা?
মুছিলে চুম্বনরাগে-চিহ্নিত বঙ্কিম রেখালতা
রক্তিম অঙ্কনে?
অগীতসংগীতধার,
অশ্রুর সঞ্চয়ভার,
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্ন ভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে।
তোমার তাণ্ডবনৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি?
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি
লুপ্ত দিনগুলি?

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর স্থবিরের-শাসন-নাশন
বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে !
বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে !
ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী—
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্যবিকশিত লাজ !
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল, রক্ত-আঁখি,
দেখে তব শুভ্র তনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্যরুচি।
অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবীবল্লরীমূলে—
ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি!
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

কার্তিক ১৩৩০

প্রকাশ

খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল,
সে পথ আমায় দাও নি তুমি বলে।
বাহির-দ্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মাঝে হাসির কোলাহল,
দেখে এলেম চলে।
এই ছবি মোর ছিল মনে—
নির্জন মন্দিরের কোণে
দিনের অবসানে
সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যাতারার পানে।
নিভৃত ঘর কাহার লাগি
নিশীথ-রাতে রইল জাগি,
খুলল না তার দ্বার।
হে চঞ্চলা, তুমি বুঝি
আপনিও পথ পাও নি খুঁজি,
তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার।

জানি, তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে,
আপন গন্ধে বকুল মাতোয়ারা।
কাঙাল সুরে দখিন-বাতাস বনে বনে গুপ্ত কী ধন মাগে,
বেড়ায় নিদ্রাহারা।
হায় গো তুমি জান না যে,
তোমার মনের তীর্থ-মাঝে
পূজা হয় নি আজো।
দেবতা তোমার বুভুক্ষিত, মিথ্যা ভূষায় কী সাজ তুমি সাজ'।
হল সুখের শয়ন পাতা,
কণ্ঠহারের মানিক গাঁথা,
প্রমোদ-রাতের গান,
হয় নি কেবল চোখের জলে
লুটিয়ে মাথা ধুলার তলে
আপন-ভোলা সকল-শেষের দান।

ভোলাও যখন তখন সে কোন্ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে;
ভুলবে যখন তখন প্রকাশ পাবে—
উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখির নীলাম্বরে
গভীর অনুভাবে।
ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
নয় আপনার উপাসনা,
নয়কো অভিমান—
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পরিমাণ।
আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখসাগর-তীরে

লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম-অপরূপ।

৯ কার্তিক ১৩৩১

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি,
হে কালো কাজল আঁখি!

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তার বেণু।
বলে, এসো এসো, লও খুঁজে লও মোরে,
মধুসঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ করে,
এসো এ বক্ষোমাঝে—
কবে হবে দিন আঁধারে-বিলীন সাঁঝে।

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবনবেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কী যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হেরো কী আশায় মাতি
আছে অঞ্জলি পাতি।

হেরো গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণপক্ষ প্রসারি সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হতে নাহি জানি।

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
এখনো তোমার সময় আসিল না কি।
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমিরবাঁধ,
পাও নি কি সংবাদ।
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটে নি কি সে বারতা।
শোন নি কী গাহে পাখি,
হে কালো কাজল আঁখি!

শিশিরশিহরা পল্লবঝলমল্
বেণুশাখাগুলি খনে খনে টলমল্,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল—
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি!

১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩১

জুঁই

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই !
অজানা ভাষার দেশে
সহসা বলিলি এসে,
'আমারে চেন কি ?'
তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
'চিনি, চিনি, সখী !'
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
'আমি ভালোবাসি।'

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই !
আজ তাই পড়ে মনে
বাদলসাঁঝের বনে
ঝরো ঝরো ধারা—
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া
যেন কী-স্বপনে পাওয়া
ঘুরে ঘুরে সারা।
সজলতিমিরতলে তোর গন্ধ বলেছে নিশ্বাসি,
'আমি ভালোবাসি।'

মিলনসুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই,
ও আমার জুঁই !
মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল,

মাধুরী ধরে না প্রাণে—
কী বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল।
সে রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আসি,
'আমি ভালোবাসি।'

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস তুই,
ও আমার জুঁই!
বক্ষে এনেছিস কার
যুগযুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া,
বারে বারে দ্বারে এসে
কোন্ নীরবের দেশে
ফিরে ফিরে যাওয়া।
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্ বাঁশি,
'আমি ভালোবাসি।'

৫ পৌষ ১৩৩১

বদল

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি
আমি আনিলাম দুখবাদলের ফল।
শুধালেম তারে, 'যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।'
হাসি কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী,
'এসো-না, বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অশ্রুর রসে ভরা।'

চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তার—
নিদয়া সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা।
সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

৪ মাঘ ১৩৩১

মাধুরীর ধ্যান

পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি
জানি হে জানি কঠোর বৈরাগী!
সুদূর পথে চরণ-দুটি বাজে
পূরবকূলে বকুলবীথি-মাঝে,
লুটায়ে-পড়া অমলনীল সাজে
নবকেতকীকেশর আছে লাগি।
তাহারই ধ্যান পরানে তব জাগি।

রাখাল বেণু বাজায় তরুতলে,
রাগিণী তার তাহারই কথা বলে।
ভূতলে খসি পড়িছে পাতাগুলি

চলিতে পাছে চরণে লাগে ধূলি—
কৃষ্ণচূড়া রয়েছে খেলা ভুলি
পথে তাহারে ছায়া দিবারই লাগি।
তাহারই ধ্যান পরানে আছে জাগি।

কাঁকন-ধ্বনি তপোবনের পারে
চপল বায়ে আসিছে বারে বারে।
কপোত-দুটি তাহারই সাড়া পেয়ে
চাঁপার ডালে উঠিছে গেয়ে গেয়ে,
মরমে তব মৌনী আছে চেয়ে
আপন-মাঝে তাহারই বাণী মাগি।
তাহারই ধ্যান পরানে আছে জাগি।

২০ ফাল্গুন ১৩৩৩

কী গান ঘনালো মনে

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনালো মনে।
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল-আঁধার মাতালো তোমার হিয়া—
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহদীপনদীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন্ লিপিকা—
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।

মনে পড়িল কি ঘনকালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ—
শিখীপুচ্ছের পাখা-সাথে দুলে দুলে
কাঁকন-দোলন ছন্দ ?
মনে পড়িল কি নীলনদীজলে
ঘনশ্রাবণের ছায়া ছলছলে,
মিলি মিলি সেই জলকলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ—
স্থকিত পায়ের চলা দ্বিধাহত—
ভীরু নয়নের পল্লব নত—
না-বলা কথার আভাসের মতো
নীলাম্বরের প্রান্ত ?
মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলে ঝারি
তরুতলে-তলে ঢেলে চলে বারি
সেচনশিথিল বাহু-দুটি তারি
ব্যথায় আলসে ক্লান্ত ?

ওগো সন্ন্যাসী পথ যায় ভাসি
ঝরঝর ধারাজলে
তমালবনের নিবিড়তিমিরতলে।
দ্যুলোক ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চিরবিরহের কথা।
বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি
নীপ-অঞ্জলি রচে বসি গৃহকোণে—
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।
কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি
আতুর নয়নে দু হাতে আঁচল ঝাঁপে।

তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরজ নাহি নাহি,
মল্লাররাগে গর্জিয়া ওঠ গাহি—
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।

যাক যাক তব মন গ'লে গ'লে যাক,
গান ভেসে গিয়ে দূরে চলে চলে যাক—
বেদনার ধারা দুর্দাম দিশাহারা
দুখদুর্দিনে দুই কূল তার ছাপে।
কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি,
সেইমত তব কম্পিত বাহু তুলি
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি—
আজ, সন্ন্যাসী, কাজ নাই জপে-জাপে।

[১ চৈত্র ১৩৩৩]

বোধন

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি,
তার পানে হায় শেষ চাওয়া চায় করুণ কুন্দকলি।
উত্তরবায় একতারা তার
তীব্র নিখাদে দিল ঝংকার,
শিথিল যা ছিল তারে ঝরাইল— গেল তারে দলি দলি।

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু আনিবে সে ধরণীতে।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয়মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নববর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে ফিরে জয় করে নিতে।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার, সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার,
তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে উদ্ধত অবহেলা।

বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়'— কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থরথর করি উঠুক পরান প্রান্তরে পর্বতে।

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়— 'করো ত্বরা, করো ত্বরা।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্‌ভ রক্তিম রাগে,
মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে মধুপের মনোহরা।'

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র কঠোর যতন-ভরে—
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার জয়সংগীতস্বরে।
নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর রিক্ত হবার তরে।

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল— শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে, মাধুরীর মঞ্জরী।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায় জাগে শ্যামাসুন্দরী।

দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চল্‌তি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়্‌না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝল্‌কানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন্ সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে অরুণকিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন্-গুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন,
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিত-কিরণে দীপ্ত।

আষাঢ় ১৩৩৫

সন্ধান

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে।
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে—
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে;
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় ম'জে।

আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে।

? শ্রাবণ। ১৩৩৫

অর্ঘ্য

সূর্যমুখীর বর্ণে বসন লই রাঙায়ে,
অরুণ-আলোর ঝংকার মোর লাগলো গায়ে।
অঞ্চলে মোর কদম ফুলের ভাষা
বক্ষে জড়ায় আসন্ন কোন্ আশা,
কৃষ্ণকলির হেমাঞ্জলির চঞ্চলতা
কঞ্চুলিকার স্বর্ণলিখায় মিলায় কথা।

আজ যেন পায় নয়ন আপন নতুন জাগা।
আজ আসে দিন প্রথম-দেখার-দোলন-লাগা।
এই ভুবনের একটি অসীম কোণ,
যুগল প্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায় নাই জানা কে
সাগর-পারের পান্থপাখির ডানার ডাকে।

চলব ডালায় আলোক-মালায় প্রদীপ জেলে,
ঝিল্লিঝনন অশোক-তলায় চমক মেলে।

আমার প্রকাশ নতুন বচন ধ'রে,
আপ্‌নাকে আজ নতুন রচন ক'রে,
ফাগুন-বনের গুপ্ত ধনের আভাস-ভরা,
রক্তদীপন প্রাণের আভায় রঙিন-করা।

চক্ষে আমার জ্বলবে আদিম অগ্নিশিখা,
প্রথম ধরায় সেই-যে পরায় আলোর টিকা।
নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি
করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্‌বোধনী—
প্রাণ-দেবতার মন্দির-দ্বার যাক রে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল অরূপ ফুলে।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩২

শুভযোগ

যে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে
উৎসুক ধরণী—
সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তার তরঙ্গের ধন্য-ধন্য ধ্বনি
মন্দ্রিয়া উঠিল কূলে কূলে,
নদীর গদ্‌গদ বাণী অশ্রুবেগে উঠে ফুলে ফুলে
কোটালের বানে,
কী চেয়েছে কী বলেছে আপনি না জানে,
সে সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে।

যে বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে,

পলাশের কুঁড়ি

এক রাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি,
শিমুল পাগল হয়ে মাতে
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে—
পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা,
উচ্ছ্বসিত সে এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫

বরণডালা

আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার অঙ্গমাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক-মালার সাজে।
নব বসন্তে লতায় লতায় পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণকূলে।
আমার দেহের বাণীতে সে দোল উঠিছে দুলে,
এ বরণ-গান নাহি পেলে মান মরিব লাজে—
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম ছন্দ বাজে।

অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয় বাঁধন-হারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি হোক-না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন ঝলিছে তারা,
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক তেমনি রাজে—
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর সকল কাজে।

২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো।
বনের মন্দিরমাঝে
তরুর তম্বুরা বাজে
অনন্তের উঠে স্তবগান—
চক্ষে জল ব'হে যায়,
নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ।

দেবতার বর—
কত জন্ম, কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে
লিখিছে আকাশ-পাতে
এ দেখার আশ্বাস-অক্ষর।
অস্তিত্বের পারে পারে
এ দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি
আমার উন্মনা আঁখি
এ দেখার গূঢ় গান গাহে।

বোলো আজি তারে—
'চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে
বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি,
আমার গুণ্ঠনখানি—
কাঁদায়েছে সেতারের তার।'

বোলো তারে আজ,
'অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম—
আজি মোর দৈন্য কোরো ক্ষমা।'

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

নিবেদন

অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায় বেঁধেছি তার।

যেমন নূতন বনের দুকূল
যেমন নূতন আমের মুকুল
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের নূতন দ্বার—
তেমনি আমার নবীন রাগের
নব যৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া বীণার তার।

যে বাণী আমার কখনো কারেও হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন নৃত্যকলা।
আজি অকারণমুখর বাতাসে
যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার—
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ
উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে,
ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়— তুমি আছ, আমি আছি।

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গম পথমাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।

রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব—
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব— তুমি আছ, আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন মরীচিকা- পিছে পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী— তুমি আছ, আমি আছি।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্নমেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে;
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায়;
শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষুকটাক্ষচ্ছটায়।

সে দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষণ্ণ ছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে।

মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে—
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধুলায়।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিনু উপহার।

সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে, সখী,
একটি কেতকী।
তখনো হয় নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে।

দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া,
গোপনে হাসিয়া।
শুধালেম আমি কৌতূহলী
'কী এনেছ' বলি।
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত।

ঝঙ্কারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে।
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।
সহজসাধনলব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন—
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।

নিষেধে নিরুদ্ধ যে সম্মান
তাই তব দান।

৪ ভাদ্র ১৩৩৫

দায়মোচন

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল—
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল—
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দু দিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাস যদি বেসো।

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে, হে চিরবিরহী—
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
রবে তব বিস্মৃতিতলে।

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে—
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি—
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।

৭ ভাদ্র ১৩৩৫

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা!
নত করি মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।
শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্‌গা-পাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন

কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি পণ।

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন,
সে লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার—
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

দেখা হবে ক্ষুব্ধসিন্ধুতীরে—
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্তে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্রপাখির পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি,
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে

কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৫

প্রতীক্ষা

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে,
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।
অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্যপ্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা,
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।

দীর্ঘ এ দুর্গম পথ মধ্যাহ্নতাপিত,
অনিদ্রায় রজনী যাপিত—
শুষ্কবাক্যবালুকার ঘূর্ণিপাক-ঝড়ে
পথিক ধুলায় শুয়ে পড়ে।
নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা—
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা,
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্ব শিখা বিপুল বিশ্বাস।

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চিরসত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

১ ভাদ্র ১৩৩৫

লগ্ন

প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে,
যেদিন গৈরিক বস্ত্র ছাড়ে
আসন্নের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা।
প্রাঙ্গণের চারি ধার ঢাকিয়া সজল আচ্ছাদনে
যেদিন সে বসে প্রসাধনে
ছায়ার আসন মেলি;
পরি লয় নূতন সবুজ-রঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন;
দিগন্তের অভিষেকে
বাতাস অরণ্যে ফিরি নিমন্ত্রণ যায় হেঁকে হেঁকে।
যেদিন প্রণয়ীবক্ষতলে
মিলনের পাত্রখানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে,
কবির সংগীত বাজে গভীর বিরহে।—
নহে নহে, সেদিন তো নহে।

সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে,
যেদিন বাতাস ফিরে গন্ধ চিনে চিনে
সবিস্ময়ে বনে বনে ;
শুধায় সে মল্লিকারে কাঞ্চন-রঙ্গনে,
'তুমি কবে এলে ?'
নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধুলায় দেয় ফেলে
ঐশ্বর্যগৌরবে।
কলরবে
অজস্র মিশায় বিহঙ্গম
ফুলের বর্ণের রঙ্গে ধ্বনির সংগম ;
অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতিসংঘ আনে পাখায় পাখায়
বসন্তের বর্ণমালা চিত্রল অক্ষরে ;
ধরণী যৌবনগর্বভরে
আকাশেরে নিমন্ত্রণ করে যবে
উদ্দাম উৎসবে ;
কবির বীণার তন্ত্র যে বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে
প্রমত্ত উৎসাহে।
আকাশে বাতাসে
বর্ণের গন্ধের উচ্ছ্বাসে
ধৈর্য নাহি রহে।—
নহে নহে, সেদিন তো নহে।

যেদিন আশ্বিনে শুভক্ষণে
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হল ধনে।
সঘনশস্পিত তট লভিল সঙ্গিনী
তরঙ্গিণী—

তপস্বিনী সে-যে, তার গম্ভীর প্রবাহে
সমুদ্রবন্দনাগান গাহে।
মুছিয়াছে নীলাম্বর বাষ্পসিক্ত চোখ,
বন্ধমুক্ত নির্মল আলোক।
বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।
অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিনী নিরবগুণ্ঠিত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।
দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিল প্রবাসী।
সেই স্নিগ্ধ ক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
পূর্ণতায়-গম্ভীর অম্বরে,
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে।

৩ ভাদ্র ১৩৩৫

স্পর্ধা

শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত ; প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে ; বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার ;
কলুষকুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার ;

আবেশে-মন্থর কণ্ঠে গদ্‌গদ সে প্রার্থনা জানায় ;
আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্‌বুদিয়া— ফেটে যায়, দেয় খুলি
রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্পনাবিকার তার শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি।— যেন প্রাণপণ বলে
মন তারে করে কশাঘাত। জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দূষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

১৪ ভাদ্র ১৩৩৫

সৃষ্টিরহস্য

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব
নিখিলের অস্তিত্বগৌরব!
তুমি আছ, তুমি এলে,
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন।
অন্তহীন কাল আর অসীম গগন,
নিদ্রাহীন আলো,
কী অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলালো।
যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়
অগ্নিময়ী বেদনায়
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।
সেই সৃষ্টিতপস্যার সার্থক আনন্দ মোর চিতে

স্পর্শ করে, যবে তব মুখে মেলি আঁখি
সম্মুখে তোমার বসে থাকি।

৪ ভাদ্র ১৩৩৫

গুপ্তধন

আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক, বলো বলো—
সে মোর অগম অন্তরপারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

দ্বিধাভরে আজও প্রবেশ কর নি ঘরে,
বাহির-আঙনে করিলে সুরের খেলা—
জানি না কী নিয়ে যাবে যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষ-বিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জেলে
রক্ত-আগুনে প্রাণে মোর জলোজলো।

১৪ কার্তিক ১৩৩৫

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি ; বসন্তের আনন্দভাণ্ডার
তখনো হয় নি নিঃস্ব ; আমার বরণপুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্‌ভ্রান্ত সমীর
এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি লয়ে হাতে,
ফিরে দেখ নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্তপঞ্চমে,
আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সংগমে
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাঞ্চল্য বিস্তার
সৌরভবিহ্বল শুক্লরাতে। সেই কুঞ্জগৃহদ্বার
এতকাল মুক্ত ছিল। প্রতি দিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছি আলিপনা। প্রতি সন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ লিখন—
আমারে আড়াল ক'রে আমারে করিবে অন্বেষণ ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
যে পথ করিলে শুরু সে পথের এখানেই শেষ।

হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ,
নাই অভিমানতাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায় ;
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ ; আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব

প্রত্যাগত

নন্দলাল বসু

অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।
আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর; আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব-আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ-চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে। দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা বলা।

২৭ পৌষ ১৩৩২

ছবি

একলা বসে, হেরো, তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া—
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।
সমুখ-পানে বালুতটের তলে
শীর্ণ নদী শান্ত ধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে
উঠিছে স্পন্দিয়া।

মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে
প্রজাপতির দল যেখানে জুটি
রঙ ছড়ালো প্রফুল্ল রঙ্গণে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিলমঞ্জরি
গোলক-চাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি
তোমারে নন্দিয়া।

ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে
দোয়েল দোলে সংগীতে চঞ্চলি—
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে স্বর্ণ-অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে,
বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে ক্রন্দিয়া।

১৭ বৈশাখ ১৩৩৮

অপ্রকাশ

মুক্ত হও হে সুন্দরী! ছিন্ন করো রঙিন কুয়াশা,
অবনত দৃষ্টির আবেশ, এই অবরুদ্ধ ভাষা—
এই অবগুণ্ঠিত প্রকাশ। সযত্ন লজ্জার ছায়া
তোমারে বেষ্টন করি জড়ায়েছে অস্পষ্টের মায়া
শত পাকে, মোহ দিয়ে সৌন্দর্যেরে করেছে আবিল—
অপ্রকাশে হয়েছ অশুচি। তাই তোমারে নিখিল
রেখেছে সরায়ে কোণে। ব্যক্ত করিবার দীনতায়
নিজেরে হারালে তুমি, প্রদোষের জ্যোতিঃক্ষীণতায়
দেখিতে পেলে না আজও আপনারে উদার আলোকে—
বিশ্বেরে দেখ নি, ভীরু, কোনোদিন বাধাহীন চোখে
উচ্চশির করি।

স্বরচিত সংকোচে কাটাও দিন,
আত্ম-অপমানে চিত্ত দীপ্তিহীন— তাই পুণ্যহীন।
বিকশিত স্থলপদ্ম পবিত্র সে, মুক্ত তার হাসি—
পূজায় পেয়েছে স্থান আপনারে সম্পূর্ণ বিকাশি।

একলা বসে হেরো তোমার ছবি
এঁকেছি আজ বসন্তী রং দিয়া।
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী
মৌমাছি ঐ গুঞ্জরে বন্দিয়া।
সমুখেতে বালুতটের তলে
শীর্ণ নদী শ্রান্তধারায় চলে,
বেণুছায়া তোমার চেলাঞ্চলে
উঠিছে স্পন্দিয়া॥

মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি
ছায়ায় ছন্ন অরণ্য অম্বরে।
প্রজাপতির দল যেথায় জুটি
রং ছড়ালো প্রফুল্ল চত্বরে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিল মঞ্জরী
গোলকচাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়চে ঝরি ঝরি
তোমারে নন্দিয়া॥

ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে
দোয়েল দোলে সঙ্গীতে চঞ্চলি।
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে
তোমার কোলে সুবর্ণ অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে,
বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
ফিরিছে ক্রন্দিয়া॥

২৭ বৈশাখ
১৩৩৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছায়াচ্ছন্ন যে লজ্জায় প্রকাশের দীপ্তি ফেলে মুছি,
সত্তার ঘোষণাবাণী স্তব্ধ করে, জেনো সে অশুচি।
উর্ধ্বশাখা বনস্পতি যে ছায়ারে দিয়েছে আশ্রয়
তার সাথে আলোর মিত্রতা— সমুন্নত সে বিনয়।
মাটিতে লুটিছে গুল্ম সর্ব-অঙ্গ ছায়াপুঞ্জ করি,
তলে গুপ্ত গহ্বরেতে কীটের নিবাস।

হে সুন্দরী,
মুক্ত করো অসম্মান, তব অপ্রকাশ-আবরণ।
হে বন্দিনী, বন্ধনেরে কোরো না কৃত্রিম আভরণ।
সজ্জিত লজ্জার খাঁচা সেথায় আত্মার অবসাদ—
অর্ধেক বাধায় সেথা ভোগের বাড়ায়ে দিতে স্বাদ,
ভোগীর বাড়াতে গর্ব, খর্ব করিয়ো না আপনারে
খণ্ডিত জীবন লয়ে আচ্ছন্ন চিত্তের অন্ধকারে।

৬ মাঘ ১৩৩৮

পুষ্পচয়িনী

হে পুষ্পচয়িনী
ছেড়ে আসিয়াছ তুমি কবে উজ্জয়িনী
মালিনী ছন্দের বন্ধ টুটে।
বকুল উৎফুল্ল হয়ে উঠে
আজও বুঝি তব মুখমদে।
নূপুররণিত পদে
আজও বুঝি অশোকের ভাঙাইবে ঘুম।
কী সেই কুসুম
যা দিয়ে অতীত জন্মে গণেছিলে বিরহের দিন ?
বুঝি সে ফুলের নাম বিস্মৃতিবিলীন
ভর্তৃপ্রসাদন ব্রতে যা দিয়ে গাঁথিতে মালা

সাজাইতে বরণের ডালা।
মনে হয় যেন তুমি ভুলে-যাওয়া তুমি—
মর্ত্যভূমি
তোমারে যা বলে জানে সেই পরিচয়
সম্পূর্ণ তো নয়।
তুমি আজ
করেছ যে অঙ্গসাজ
নহে সদ্য আজিকার।
কালোয় রাঙায় তার
যে ভঙ্গিটি পেয়েছে প্রকাশ
দেয় বহু দূরের আভাস।
মনে হয় যেন অজানিতে
রয়েছ অতীতে।
মনে হয় যে প্রিয়ের লাগি
অবন্তীনগরসৌধে ছিলে জাগি
তাহারই উদ্দেশে,
না জেনে সেজেছ বুঝি সে যুগের বেশে।
মালতী শাখার 'পরে
এই-যে তুলেছ হাত ভঙ্গিভরে
নহে ফুল তুলিবার প্রয়োজনে,
বুঝি আছে মনে—
যুগ-অন্তরাল হতে বিস্মৃত বল্লভ
লুকায়ে দেখিছে তব সুকোমল ও করপল্লব।
অশরীরী মুগ্ধনেত্র যেন গগনে সে
হেরে অনিমেষে
দেহভঙ্গিমার মিল লতিকার সাথে
আজি মাঘী পূর্ণিমার রাতে।

বাতাসেতে অলক্ষিতে যেন কার ব্যাপ্ত ভালোবাসা
তোমার যৌবনে দিল নৃত্যময়ী ভাষা।

১০ মাঘ ১৩৩৮

পুষ্প

পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে, হে নারী, তোমার অপেক্ষায়
পল্লবচ্ছায়ায়।
তোমার নিশ্বাস তারে লেগে
অন্তরে সে উঠিয়াছে জেগে—
মুখে তব কী দেখিতে পায়।

সে কহিছে, ‘বহুপূর্বে তুমি আমি কবে এক সাথে
আদিম প্রভাতে
প্রথম আলোকে জেগে উঠি
এক ছন্দে বাঁধা রাখী দুটি
দুজনে পরিনু হাতে হাতে।

আধো আলো অন্ধকারে উড়ে এনু মোরা পাশে পাশে
প্রাণের বাতাসে।
একদিন কবে কোন্ মোহে
দুই পথে চলে গেনু দোঁহে
আমাদের মাটির আবাসে।

বারে বারে বনে বনে জন্ম লই নব নব বেশে
নব নব দেশে।
যুগে যুগে রূপে রূপান্তরে
ফিরিনু সে কী সন্ধান-তরে
সৃজনের নিগূঢ় উদ্দেশে।

অবশেষে দেখিলাম কত জন্ম-পরে নাহি জানি
ওই মুখখানি।
বুঝিলাম আমি আজো আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি,
তুমি পেলে চরমের বাণী।

তোমার আমার দেহে আদি ছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল স্বর চলে—
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।

কী যে বলে সেই স্বর, কোন্ দিকে তাহার প্রত্যাশা
জানি নাই ভাষা।
আজ, সখী, বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি—
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।

১১ মাঘ ১৩৩৮

কুমার

কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী,
অভিষেক-তরে এনেছে তীর্থবারি।
সাজাবে অঙ্গ উজ্জ্বল বরবেশে,
জয়মাল্য যে পরাবে তোমার কেশে—
বরণ করিবে তোমারে সে উদ্দেশে
দাঁড়ায়েছে সারি সারি।

ছবি

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেরো জাগে সে যে রাতের প্রহর গণি,
তোমার বিজয়শঙ্খ উঠুক ধ্বনি।
গর্জিত তব তর্জনধিক্কারে
লজ্জিত করো কুৎসিত ভীরুতারে—
মন্দ্রিত হোক বন্দীশালার দ্বারে
মুক্তির জাগরণী।

তুমি এসে যদি পাশে নাহি দাও স্থান,
হে কিশোর, তাহে নারীর অসম্মান।
তব কল্যাণে কুঙ্কুম তার ভালে,
তব প্রাঙ্গণে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে—
তব বন্দনে সাজায় পূজার থালে
প্রাণের শ্রেষ্ঠ দান।

চেয়ে আছে নারী, প্রদীপ হয়েছে জ্বালা—
বিফল কোরো না বীরের বরণডালা।
মিলনলগ্ন বারে বারে ফিরে যায়
বরসজ্জার ব্যর্থতা-বেদনায়—
মনে মনে সদা ব্যথিত কল্পনায়
তোমারে পরায় মালা।

তব রথ তারা স্বপ্নে দেখিছে জেগে—
ছুটিছে অশ্ব বিদ্যুৎ-কষা লেগে।
ঘুরিছে চক্র বহ্নিবরণ সে যে,
উঠিছে শূন্যে ঘর্ঘর তার বেজে,
প্রোজ্জ্বল চূড়া প্রভাতসূর্যতেজে—
ধ্বজা রঞ্জিত রাঙা সন্ধ্যার মেঘে।

অদূরে স্থনীল সাগরে ঊর্মিরাশি
উত্তাল বেগে উঠিছে সমুচ্ছ্বাসি।
পথিক ঝটিকা রুদ্রের অভিসারে
উধাও ছুটিছে সীমাসমুদ্রপারে,
উল্লোল কলগর্জিত পারাবারে
ফেনগর্গরে ধ্বনিছে অট্টহাসি।

আত্মলোপের নিত্য নিবিড় কারা,
তুমি উদ্দাম সেই বন্ধনহারা।
কোনো শঙ্কার কার্মুকটঙ্কারে
পারে না তোমারে বিহ্বল করিবারে—
মৃত্যুর ছায়া ভেদিয়া তিমিরপারে
নির্ভয়ে ধাও যেথা জ্বলে ধ্রুবতারা।

চাহে নারী তব রথসঙ্গিনী হবে—
তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।
অবারিত পথে আছে আগ্রহভরে
তব যাত্রায় আত্মদানের তরে;
গ্রহণ করিয়ো সম্মানে সমাদরে—
জাগ্রত করি রাখিয়ো শঙ্খরবে।

১৬ কার্তিক। ১২ মাঘ
১৩৩৮

নির্বাক্

মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু যে কথা আমি বলি নি আর-কারে,
সেদিন বনে মাধবীশাখা নিচু ফুলের ভারে ভারে।
বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি বিরহব্যথাবৃন্ত হতে ভাঙা—
গোপন রাতে উঠেছে তারা ছুলি স্থরের রঙে রাঙা।

শিরীষবন নতুন-পাতা-ছাওয়া মর্মরিয়া কহিল 'গাহো গাহো'।
মধুমালতীগন্ধে-ভরা হাওয়া দিয়েছে উৎসাহ।
পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া নদীর জল ছলছলিয়া উঠে।
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া, ঘাসের 'পরে লুটে।

সে মধুরাতে আকাশে ধরাতলে কোথাও কিছু ছিল না কৃপণতা।
চাঁদের আলো সবার হয়ে বলে যত মনের কথা।

মনে হল যে, নীরবে কৃপা যাচে যা-কিছু আছে তোমার চারি দিকে।
সাহস ধরি গেলেম তব কাছে, চাহিনু অনিমিখে।
সহসা মন উঠিল চমকিয়া, বাঁশিতে আর বাজিল না তো বাণী।
গহনছায়ে দাঁড়ানু থমকিয়া, হেরিনু মুখখানি।

সাগরশেষে দেখেছি একদিন মিলিছে সেথা বহু নদীর ধারা—
ফেনিল জল দিক্‌সীমায় লীন অপারে দিশাহারা,
তরণী মোর নানা স্রোতের টানে অবোধসম কাঁপিছে থরথরি,
ভেবে না পাই কেমনে কোন্‌খানে বাঁধিব মোর তরী।

তেমনি আজি তোমার মুখে চাহি নয়ন যেন কূল না পায় খুঁজি,
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি তোমারে নাহি বুঝি।
নিবিড় হয়ে নামিল মোর মনে স্তব্ধ তব নীরব গভীরতা—
রহিনু বসি লতাবিতান-কোণে, কহি নি কোনো কথা।

মাঘ ১৩৩৮

প্রতীক্ষা

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে, নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল।

চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের 'পরে। স্তম্ভিত সমীরে
রাত্রির প্রহরশেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্বতট-পানে— প্রথম আলোকে
স্পর্শমান হবে তার এই আশা ধরি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।

তব নবজাগরণী প্রথম যে হাসি
কনকচাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধোখোলা অধরেতে, নয়নের কোণে,
চয়ন করিব তাই —এই আছে মনে।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

রাজপুত্র

রূপকথা-স্বপ্নলোক-বাসী
রাজপুত্র কোথা হতে আসি
শুভক্ষণে দেখা দেয় রূপে
চুপে চুপে,
জানি ব'লে জেনেছিনু যারে
তারি মাঝে। আমার সংসারে
বক্ষে মোর আগমনী পদধ্বনি বাজে
যেন বহু দূর হতে আসা।
তার ভাষা

প্রাণে দেয় আনি
সমুদ্রপারের কোন্ অভিনব যৌবনের বাণী।

সেদিন বুঝিতে পারে মন
ছিল সে যে নিশ্চেতন
তুচ্ছতার অন্তরালে
এতকাল মায়ানিদ্রাজালে।
তার দৃষ্টিপাতে মোরে নূতন সৃষ্টির ছোঁওয়া লাগে,
চিত্ত জাগে।
বলি তার পদযুগ চুমি,
'রাজপুত্র তুমি।'

এতদিন
আত্মপরিচয়হীন
জড়তার পাষাণপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা
দুর্গ-মাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা।
কোন্ মন্ত্রগুণে
সে দুর্ভেদ বাধা যেন দাহিলে আগুনে,
বন্দিনীরে করিলে উদ্ধার,
করি নিলে আপনার—
নিয়ে গেলে মুক্তির আলোকে।
আজিকে তোমারে দেখি কী নূতন চোখে।
কুঁড়ি আজ উঠেছে কুসুমি—
বার বার মন বলে, 'রাজপুত্র তুমি।'

২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮

প্রণাম

তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ
যারে তুমি করেছ বরণ।
তুমি মূল্য দিলে তারে
দুর্লভ পূজার অলংকারে।
ভক্তিসমুজ্জ্বল চোখে
তাহারে হেরিলে তুমি যে শুভ্র আলোকে
সে আলো করালো তারে স্নান ;
দীপ্যমান মহিমার দান
পরাইল ললাটের 'পর।
হোক সে দেবতা কিম্বা নর,
তোমারি হৃদয় হতে বিচ্ছুরিত রশ্মির ছটায়
দিব্য আবির্ভাবে তার প্রকাশ ঘটায়।
তার পরিচয়খানি
তোমাতেই লভিয়াছে জয়বাণী।
রচিয়া দিয়াছে তার সত্য স্বর্গপুরী
তোমারি এ প্রীতির মাধুরী।
যে অমৃত করে পান
ঢালে তাহা তোমারি এ উচ্ছ্বসিত প্রাণ।
তব শির নত
দিক্‌রেখায় অরুণের মতো,
তারি 'পরে দেবতার অভ্যুদয়
রূপ লভে সুপ্রসন্ন পুণ্য জ্যোতির্ময়।

১৭ চৈত্র ১৩৩৮

নারী

স্বাতন্ত্র্যস্পর্ধায় মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে আনন্দরস
রূপ ধরেছিল রমণীতে,
ধরণীর ধমনীতে
তুলেছিল চাঞ্চল্যের দোল
রক্তিম হিল্লোল,
সেই আদি-ধ্যানমূর্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
রূপকার মনে মনে
বিধাতার তপস্যার সংগোপনে।

পলাতকা লাবণ্য তাহার
বাঁধিবারে চেয়েছে সে আপন সৃষ্টিতে
প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে।
দুর্বাধ্য প্রস্তরপিণ্ডে দুঃসাধ্য সাধনা
সিংহাসন করেছে রচনা
অধরাকে করিতে আপন
চিরন্তন।

সংসারের ব্যবহারে যত লজ্জা ভয়
সংকোচ সংশয়,
শাস্ত্রবচনের ঘের,
ব্যবধান বিধিবিধানের
সকলই ফেলিয়া দূরে
ভোগের অতীত মূল সুরে
নগ্নতা করেছে শুচি
দিয়ে তারে ভুবনমোহিনী শুভ্ররুচি।

পুরুষের অনন্ত বেদন
মর্তের মদিরা-মাঝে স্বর্গের সুধার অন্বেষণ।
তারই চিহ্ন যেখানে সেখানে
কাব্যে গানে,
ছবিতে মূর্তিতে
দেবালয়ে দেবীর স্তুতিতে।
কালে কালে দেশে দেশে শিল্পস্বপ্নে দেখে রূপখানি,
নাহি তাহে প্রত্যহের গ্লানি।
দুর্বলতা নাহি তাহে, নাহি ক্লান্তি—
টানি লয়ে বিশ্বের সকল কান্তি
আদিস্বর্গলোক হতে নির্বাসিত পুরুষের মন
রূপ আর অরূপের ঘটায় মিলন।

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪

পুষ্পচয়িনী

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

রঙ্গ

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিঠে দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
'বরফি মিঠে, জিলাবি মিঠে, মিঠে শোন-পাপড়ি—
তাহার অধিক মিঠে, কন্যা, কোমল হাতের চাপড়ি।'

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার সাদা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
'ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি—
তাহার অধিক সাদা তোমার পষ্ট ভাষার দাবড়ি।'

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
'উচ্ছে তিতো, পলতা তিতো, তিতো নিমের শুক্ত—
তাহার অধিক তিতো যাহা বিনি ভাষায় উক্ত।'

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার কঠিন দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
'লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা—
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।'[১]

পূর্বপাঠ : ১ কঠিন পাথর, কঠিন লোহা, কঠিন বটে ইষ্টক—
তাহার অধিক কঠিন, কন্যা, তোমার হাতের পিষ্টক।

এ তো বড়ো রঙ্গ, জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে[১] দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ।
'মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাঁচের পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।'[২]

১৩ আশ্বিন ১৩৪১

নারীপ্রগতি

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে—
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে!
নারীপ্রগতির মহাদিনে আজি
নারীপদগতি জিনিল এ বাজি।

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয় নি তো চিনে—
কেনে নি ইস্‌টিশনের টিকেট,
হৃদয়ক্ষেত্রে খেলে নি ক্রিকেট
চণ্ডবেগের ডাণ্ডাগোলায়।
তারা তো মন্দমধুর দোলায়
শান্ত মিলন-বিরহ-বন্ধে
বেঁধেছিল মন শিথিল ছন্দে।

---

১ ফাঁকি

২ স্বপ্ন ফাঁকি, প্রেত ফাঁকি, ফাঁকি যাত্রার সঙ—
তাহার অধিক ফাঁকি, কন্যা, আধুনিকার ঢঙ।

রেলগাড়ি আর মোটরের যুগে
বহু অপঘাত চলিতেছি ভুগে—
তাহারই মধ্যে এল সম্প্রতি
এ দুঃসাহস এ তড়িৎগতি,
পুরুষেরে দিল দুর্দাম তাড়া
দুর্বার তেজে নিষ্ঠুর নাড়া।
ভূকম্পনের বিগ্রহবতী
প্রলয়ধাতার নিগ্রহ অতি
বহন করিয়া এসেছে বঙ্গে
পাদুকামুখর চরণভঙ্গে।

সে ধ্বনি শুনিয়া পরলোকে বসি,
কবি কালিদাস, পড়িল কি খসি
উষ্ণীষ তব? দুরুদুরু বুকে
ছন্দ কিছু কি জুটিয়াছে মুখে।
একটি প্রশ্ন শুধাব এবার—
অকপটে তারি জবাব দেবার
আগে একবার ভেবে দেখো মনে
উত্তর পেলে রাখিব গোপনে।

স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিল যে অতীতে
তেয়াগিয়া তাহা তড়িৎগতিতে
নিতে চাও কভু তীব্রভাষণ
আধুনিকাদের কবির আসন?
মেঘদূত ছেড়ে বিদ্যুৎ-দূত
লিখিতে পাবে কি ভাষা মজবুত?

১ বৈশাখ ১৩৪১

শাপমোচন

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়
কলানায়কদের অগ্রণী।
সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে
সূর্যপ্রদক্ষিণে।
সৌরসেনের মন ছিল উদাসী।
অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে,
উর্বশীর নাচে সমে পড়ল বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।
স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে
গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল,
অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হল
গান্ধাররাজগৃহে।

মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল ;
বললে, 'বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না,
একই লোকে আমাদের গতি হোক—
একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।'
শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন।
ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু, যাও মর্তে—
সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে।
সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন-অপরাধের ক্ষয়।'

মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম নিল কমলিকা।
একদিন গান্ধারপতির চোখে পড়ল মদ্ররাজকন্যার ছবি।

সেই ছবি তার দিনের চিন্তা, তার রাত্রের স্বপ্নের 'পরে
আপন ভূমিকা রচনা করলে।
গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে।
বিবাহপ্রস্তাব শুনে রাজা বললে—
'আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।'

ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন।
রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে
মদ্ররাজসভায় এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্গবিহারিণী বীণা।
স্তব্ধসংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।

যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।
নির্বাণপ্রদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।
কমলিকা বলে, 'প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে
আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'
রাজা বলে, 'আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো।'
অন্ধকারে বীণা বাজে।
অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে
বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।
সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনা হয়ে এসেছে
তার মর্তদেহে।
নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,
নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে
তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে—
অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে
যখন শুকতারা পূর্বগগনে,

কমলিকা তার সুগন্ধি এলোচুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে ;
বললে, 'আদেশ করো, আজ উষার প্রথম আলোকে
তোমাকে প্রথম দেখব।'
রাজা বললে, 'প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে
নষ্ট কোরো না এই মিনতি।'
মহিষী বললে, 'প্রিয়প্রসাদ থেকে
আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাকবে!
অন্ধতার চেয়েও এ যে বড়ো অভিশাপ।'
অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।
রাজা বললে, 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি।
নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন।
প্রাসাদশিখর থেকে চেয়ে দেখো।'
মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল ; বললে, 'চিনব কী করে ?'
রাজা বললে, 'যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো,
সেই কল্পনাই হবে সত্য।'

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন।
মহিষী বললে, 'দেখলাম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে
বসন্তবাতাসের মত্ততা।
সকলেই সুন্দর।
যেন ওরা চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষের মানুষ।
কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে, ও যেন রাহুর অনুচর।
ওখানে কী গুণে সে পেল প্রবেশের অধিকার!'
রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল।
কিছু পরে বললে, 'ওই কুশ্রীর পরমবেদনাতেই তো
সুন্দরের আহ্বান।
কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই

সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু,
মরুনীরস কালো মর্তের অভিশাপের উপর
স্বর্গের করুণা যখন রূপ ধরে
তখনই তো শ্যামলসুন্দরের আবির্ভাব।
প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল
মধুর করে নি ?'
'না, মহারাজ, না' ব'লে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।
রাজার কণ্ঠের সুরে অশ্রুর ছোঁওয়া লাগল—
বললে, 'যাকে দয়া করলে হৃদয় তোমার ভরে উঠত
তাকে ঘৃণা ক'রে মনকে কেন পাথর করলে !'
'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে'
এই ব'লে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল।
রাজা তার হাত ধরলে—
বললে, 'একদিন সইতে পারবে
আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে।
কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।'
ভ্রূ কুটিল করে মহিষী বললে—
'অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝি নে।
ওই শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক,
অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি।
আজ সূর্যোদয়মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হবে
আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলাম।'
রাজা বললে, 'তাই হোক, ভীরুতা যাক কেটে।'

দেখা হল।
ট'লে উঠল যুগলের সংসার।
'কী অন্যায় ! কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা !'

বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

গেল বহুদূরে—
বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে, সেইখানে
কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।
রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধঘুমে সে শুনতে পায়
এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী।
স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে—
মনে হয় এই সুর চিরদিনের চেনা।

রাতের পরে রাত গেল।
অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়—
যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদার-বনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার হাহাকারমূর্তি।
এ কী হল রাজমহিষীর!
কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে!
মাটির প্রদীপ -শিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠল বুঝি।
রাত-জাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়,
তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।
বীণায় বাজতে থাকে কেদারা, বেহাগ, বাজে কালাংড়া।
আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন
তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।
রাজমহিষী বিছানার 'পরে উঠে বসে।
স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ।
বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয়
এক অন্তহীন অভিসারের পথ।

রাগিণী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন!
কার দিকে? দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।

একদিন নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে
অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে।
মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ালো।
নীচে সেই ছায়ামূর্তির নৃত্য, বিরহের সেই ঊর্মিদোলা।
মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত।
ঝিল্লিঝংকৃত রাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে।
অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইছে।
সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে।
কখন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না।
এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের!

গেল আরো দুই রাত।
অভিসারের পথ একান্তই শেষ হয়ে আসছে এই জানলারই কাছে।
সেদিন বীণায় পরজের বিহ্বল মিড়।
কমলিকা আপন মনে নীরবে বলছে—
'ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না।
আমার আর দেরি নেই।'

কিন্তু যাবে কার কাছে!
চোখে না দেখেছিল যাকে তারই কাছে তো!
কেমন করে হবে!
দেখা-মানুষ আজ না-দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে
পাঠিয়ে দিলে সাত-সমুদ্র-পারে রূপকথার দেশে।
সেখানকার পথ কোন্ দিকে!

আরো এক রাত যায়।
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়।
আঁধারের ডাক কী গভীর!
পথ-না-জানা যত-সব গুহাগহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন,
এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।
সেই অস্ফুট আকাশবাণীর সঙ্গে মিলে
ওই-যে বাজে বীণায় কানাড়া।
রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আজ আমি যাব।
আমার চোখকে আমি আর ভয় করি নে।'
পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে
সে গেল পুরাতন অশথ গাছের তলায়।

বীণা থামল।
মহিষী থমকে দাঁড়ালো।
রাজা বললে, 'ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।'
তার গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর গুরুগুরু ধ্বনির মতো।
'আমার কিছু ভয় নেই— তোমারই জয় হল'
এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে,
ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার!'

পৌষ ১৩৩৮

হারিয়ে পাওয়া

স্থির জেনেছিলেম পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয় নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য কর নি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় ক'রে।
আড়চোখে চেয়ে আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে ;
পরদিনে মনে রইল না।
নববসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে,
'তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি ;
আরো দেওয়া হল না, আরো যে আমার নেই।'
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছল্‌ছলিয়ে।

আজ তুমি গেছ চ'লে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা, নিয়েছি তুলে বুকে।

যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার ছুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা।

*

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে।

১ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

দিলে তুমি দোলা

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা ;
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে একটি অমৃতরেখা ;
আর কোনোদিন তার দেখা মেলে নি।
জোয়ারের তরঙ্গ-লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায়।

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা
প্রাণের আধ-খোলা জাল্‌নায়
দূর বনান্ত থেকে পথ-চল্‌তি গানে।
অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মিড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়তারে

বৃষ্টিধারামুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ।

তার পরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে অকারণে অসময়ে ;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গোরু-চরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে ;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ও পার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

অচিন পাখি

রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, 'অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়।'
দেখে অবুঝ মন বলে,
'অধরাকে ধরেছি।'

তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়ে ছিলে জানলায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের পল্লবে,

অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের মধুরিমায়।
ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে, ও গেল চলে ;
জানলে না এই গানে তোমারই কথা।

তুমি রাগিণীর মতো আস যাও
একতারার তারে তারে।
সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।

তাকে বেড়াই বুকে করে ;
ওতে রঙ লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে ;
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য।
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে,
মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে।

অচিন পাখি তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাকো—
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,
স্থকিত ওড়ার মধ্যে।
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়।

ভুলব না

কালো অন্ধকারের তলায়
পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।
বাতাস থম্‌থমে,
গাছের পাতা নড়ে না,
স্বচ্ছ রাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লিঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে
আমার হাত ধরলে চেপে;
বললে, 'তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই।'
দীপহীন বাতায়নে
আমার মূর্তি ছিল অস্পষ্ট,
সেই ছায়ার আবরণে
তোমার অন্তরতম আবেদনের
সংকোচ গিয়েছিল কেটে।
সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তের আনন্দবেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্ম-জন্মান্তরে
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।

তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।
তোমার সংসারে অসংখ্য যা-কিছু আছে
তার সব-চেয়ে অত্যন্ত ক'রে আছি আমি
অত্যন্ত বেঁচে।

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ—
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাব নেপথ্যে।
প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে
মূর্তিমান অসংখ্যতার কাছে
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব।
তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া
যার তলায় দু বেলা জল দাও আপন হাতে,
সেও প্রধান হয়ে উঠে
তার ডাল-পালার বাইরে
সরিয়ে রাখবে আমাকে
বিশ্বের বিরাট অগোচরে।
তা হোক,
এও গৌণ।

দেখা হল

যখন দেখা হল
তার সঙ্গে চোখে চোখে
তখন আমার প্রথম বয়েস ;
সে আমাকে শুধালো,—
'তুমি খুঁজে বেড়াও কাকে ?'

আমি বললেম,
'বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন্ কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে—
যেখানে ভেসে বেড়ায়
ফুলের থেকে গন্ধ,
বাঁশির থেকে ধ্বনি।
ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে ব'লে ;
তার মৌমাছির পাখায় বাজে
খুঁজে বেড়াবার নীরব গুঞ্জরণ।'

শুনে সে রইল চুপ ক'রে
অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।
আমার মনে লাগল ব্যথা ;
বললেম, 'কী ভাবছ তুমি ?'

ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বললে,
'কেমন করে জানবে তাকে পেলে কি না,
তোমার সেই অসংখ্যের মধ্যে
একটিমাত্রকে ?'

আমি বললেম,
'আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সব-চেয়ে গোপন কথা ;
ও কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি
আমার গোপন মিল আছে তারই ভিতর।'

কোনো কথা সে বলল না।
কচি শ্যামল তার রঙটি ;
গলায় সরু সোনার হারগাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা !
চোখে ছিল একটা দিশাহারা ভয়ের চমক,
পাছে কেউ পালায় তাকে না বলে।
তার দুটি পায়ে ছিল দ্বিধা,
ঠাহর পায় নি
কোন্‌খানে সীমা তার আঙিনাতে।

দেখা হল।
সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ওইটুকু নিয়ে।

তার পরে সে চলে গেছে !

নারী

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।
উদ্দাম একটা ঢেউ হৃদয়ের তট ছাপিয়ে
হঠাৎ হল উচ্ছলিত,
ডুবিয়ে দিল সকল ভাষা,
নাম এল না মুখে।
সে দাঁড়ালো গাছের তলায়,
ফিরে তাকালো আমার কুণ্ঠিত বেদনাকরুণ মুখের দিকে।
ত্বরিত পদে এসে বসল আমার পাশে।
দুই হাতের মধ্যে আমার হাত তুলে নিয়ে বললে—
'তুমি চেনো না আমাকে, তোমাকে চিনি নে আমি।
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল সম্ভব
আমি তাই ভাবি।'
আমি বললেম, 'দুই না-চেনার মাঝখানে
চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।'

ভালোবেসেছি তাকে।
সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
অল্প বেগের সেই প্রবাহ

বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্ত প্রতিদিনের
অনুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ,
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ।
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল অতিসাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে
কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস—
আঘাত করেছে কখনো বা।
আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট-ইঙ্গিত-বাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহমনে—
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে,
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
সিসু গাছের কাঁপন-লাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুতঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল-করা তার নাচ ছায়ায় আলোয়।
ইতিহাসের সৃষ্টি-আসনে
ওকে দেখেছি বিধাতার বাম পাশে;
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
কদর্য কঠোরের অশুচি স্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে

বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয়-অগ্নি—
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
স্বষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ
আর স্বষ্টির শেষ রহস্য
ভালোবাসার অমৃত।

১৮ বৈশাখ ১৩৪৩

দ্বৈত

সেদিন ছিলে তুমি আলো-আঁধারের মাঝখানটিতে
বিধাতার মানসলোকের
মর্তসীমায় পা বাড়িয়ে
বিশ্বের রূপ-আঙিনার নাছ-দুয়ারে।
যেমন ভোরবেলাকার একটুখানি ইশারা,
শালবনের পাতার মধ্যে উস্‌খুস্‌,
শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি;
উষা যখন আপন-ভোলা—
যখন সে পায় নি আপন ডাক-নামটি পাখির ডাকে,
পাহাড়ের চূড়ায়
মেঘের লিখনপত্রে।
তার পরে সে নেমে আসে ধরাতলে—
তার মুখের উপর থেকে
অসীমের ছায়া-ঘোমটা খসে পড়ে
উদয়সাগরের অরুণ-রাঙা কিনারায়।

পৃথিবী তাকে সাজিয়ে তোলে
আপন সবুজ-সোনার কাঁচলি দিয়ে,
পরায় তাকে হাওয়ার চুনরি।

তেমনি তুমি এনেছিলে তোমার ছবির তনুরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিক্‌প্রান্তপটে।
আমি তোমার কারিগরের দোসর—
কথা ছিল তোমার রূপের 'পরে মনের তুলি
আমিও দেব বুলিয়ে,
পূরিয়ে তুলব তোমার গড়নটিকে।
দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারি দিকে—
কখনো ঝড়ের বেগে
কখনো মৃদু মৃদু দোলনে।

একদিন আপন সহজ নিরালায় ছিলে তুমি অধরা—
ছিলে তুমি একলা বিধাতার,
একের মধ্যে এক-ঘ'রে।
আমি বেঁধেছি তোমাকে দুইয়ের গ্রন্থিতে—
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে।
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
জাগিয়েছে আনন্দরূপ তোমার আপন চৈতন্যে।

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

গীতবিতান

বাজো রে বাঁশরি বাজো।

সুন্দরী, চন্দনমাল্যে মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো।

বুঝি মধুফাল্গুনমাসে চঞ্চল পান্থ সে আসে—

মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক অঙ্গনে ফোটে নি কি আজও?

রক্তিম অংশুক মাথে, কিংশুককঙ্কণ হাতে—

মঞ্জীরঝঙ্কৃত পায়ে সৌরভমন্থর বায়ে

বন্দনসঙ্গীতগুঞ্জনমুখরিত নন্দনকুঞ্জে বিরাজো।

২

ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী,

পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন—

পর্ণের পাত্রে ফাল্গুনরাত্রে মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।

এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের,

পলাশের কুঙ্কুম চাঁদিনির চন্দন—

পারুলের হিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল, মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ—

উল্লাস-উতরোল বেণুবনকল্লোল,

কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।

তব আঁখিপল্লবে দিয়ো আঁকি বল্লভে

গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন।

৩

অগ্নিশিখা, এসো এসো, আনো আনো আলো।

দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো।

আনো শক্তি, আনো দীপ্তি, আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,

আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা, আনো নিত্য ভালো।

এসো পুণ্যপথ বেয়ে এসো হে কল্যাণী—

শুভ সুপ্তি, শুভ জাগরণ দেহো আনি।
দুঃখরাতে মাতৃবেশে জেগে থাকো নির্নিমেষে,
আনন্দ-উৎসবে তব শুভ্র হাসি ঢালো।

৪ বৈশাখ ১৩৩০

৪

গহনকুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাসে লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।
পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয়কুসুমরাশ,
হরিণনেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জবনমে আও লো।
ঢালে কুসুম সুরভভার, ঢালে বিহগসুরবসার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার
বিমল রজতভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি, পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথী জাতি রে।
দেখ, লো সখি, শ্যামরায় নয়নে প্রেম উথল যায়—
মধুর বদন অমৃতসদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ, হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ—
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে।

৫

শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা,
　　নিশীথ যামিনী রে।
কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব
　　অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত,
　　ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুন্ঠিত,
　　থরহর কম্পিত দেহ।
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্
　　বরখত নীরদপুঞ্জ।
শাল-পিয়ালে তাল-তমালে
　　নিবিড়তিমিরময় কুঞ্জ।
কহ রে সজনী, এ দুরুযোগে
　　কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশি কাহ বজায়ত
　　সকরুণ রাধা নাম।
মোতিম হারে বেশ বনা দে,
　　সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলুন্ঠিত লোল চিকুর মম
　　বাঁধহ চম্পকমালে।

গহন রয়নমে ন যাও, বালা,
　　নওলকিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব,
　　কহে ভানু তব দাস।

৬

মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি—
সখি, জাগ' জাগ'।
মেলি রাগ-অলস আঁখি—
অনু রাগ-অলস আঁখি সখি, জাগ' জাগ'।
আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগ' ফাগুনগুণগীতে
অয়ি প্রথমপ্রণয়ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি— সখি, জাগ' জাগ'।
জাগ' নবীন গৌরবে,
নব বকুলসৌরভে,
মৃদু মলয়বীজনে
জাগ' নিভৃত নির্জনে।
আজি আকুল ফুলসাজে
জাগ' মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়শয়নমাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি— সখি, জাগ' জাগ'।

৭

যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলোমল টলোমল।
শরমরক্তরাগে তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধকেশর-মাঝে
এক বিন্দু নয়নজল।
ধীরে বও ধীরে বও, সমীরণ,
সবেদন পরশন।

শঙ্কিত চিত্ত মোর   পাছে ভাঙে বৃন্তডোর—
তাই   অকারণ করুণায়   মোর   আঁখি করে ছলোছল।

৮

আমার পরান লয়ে   কী খেলা খেলাবে ওগো পরানপ্রিয়!
কোথা হতে ভেসে কূলে   লেগেছে চরণমূলে   তুলে দেখিয়ো।
এ নহে গো তৃণদল   ভেসে-আসা ফুলফল—
এ যে ব্যথাভরা মন   মনে রাখিয়ো।
কেন আসে কেন যায়   কেহ না জানে।
কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে।
রাখ যদি ভালোবেসে   চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি দাও তবে   বাঁচিবে কি ও।

আশ্বিন [?১২৯৯

৯

বাজিল কাহার বীণা   মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন-'পরে।
প্রভাতকমলসম   ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম   চরণ-তরে।
জেগে উঠে সব শোভা,   সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া   পুলকে পূরি।
কোথা হতে সমীরণ   আনে নব জাগরণ,
পরানের আবরণ   মোচন করে।
লাগে বুকে সুখে দুখে   কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব   না জানি কথা।
আমার বাসনা আজি   ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনাভরে।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

১০

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে।
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে।
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে
তুমি চিরপুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি—
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

১১

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার,
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার।
নীল অম্বর চুম্বননত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার।
ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ—
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন—
লহো হৃদয়ের ফুলচন্দন বন্দন-উপহার।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১

১২

এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে, ফিরে এসো।
ওহে নিষ্ঠুর, ফিরে এসো,
আমার করুণকোমল এসো,
আমার সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসো।

বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে,
কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে!
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে।
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে
তুমি চিরপুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজেনা বাঁশি
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে।

আমার নিতিসুখ ফিরে এসো,
আমার চিরদুখ ফিরে এসো,
আমার সবসুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এসো।
আমার চিরবাঞ্ছিত এসো,
আমার চিতসঞ্চিত এসো,
ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজ- বন্ধনে ফিরে এসো।
আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,
আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো।
আমার মুখের হাসিতে এসো,
আমার চোখের সলিলে এসো,
আমার আদরে আমার ছলনে আমার অভিমানে ফিরে এসো।
আমার সকল স্মরণে এসো,
আমার সকল ভরমে এসো,
আমার ধরম-করম-সোহাগ-শরম-জনম-মরণে এসো।

ভাদ্র ১৩০১

১৩

কত কথা তারে ছিল বলিতে—
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে।
বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি
কত যে পূরবীরাগে কত ললিতে।
সে কথা ফুটিয়া উঠে কুসুমবনে,
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে।
সে কথা লইয়া খেলি হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি কার মন ছলিতে।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

১৪

আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী।
অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী।
ম্লান প্রদীপ উষানিলচঞ্চল, পাণ্ডুর শশধর গত-অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল' সখি চল' অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি।
শরতপ্রভাত নিরাময় নির্মল, শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জন বনতল শিশিরসুশীতল, পুলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহশয়নে ফেলি মলিন মালিকা এস নবভুবনে এস গো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী।

১৫ আশ্বিন ১৩০২

১৫

তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে।
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে।
ওগো ধীরমধুরহাসিনী, বোলো ধীরমধুর ভাষে—
আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে।
যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,
যবে সুপ্তিমগন বিহগনীড় কুসুমকাননে,
বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিত স্মিত হাসে—
বোলো মধুরবেদনবিধুর হৃদয়ে শরমনমিত নয়নে।

১৮ আশ্বিন ১৩০২

১৬

একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে।
একি মধুরমদির রসরাশি আজি শূন্যতলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্রকরে একি হাসি, ফুল- গন্ধ লুটে গগনে।
একি প্রাণভরা অনুরাগে আজি বিশ্বজগতজন জাগে,
আজি নিখিল নীলগগনে সুখ- পরশ কোথা হতে লাগে।

সুখে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহনবাঁশরি বাজি,
হেরো পূর্ণবিকশিত আজি মম অন্তর সুন্দর স্বপনে।

১৬ কার্তিক ১৩০২

১৭

ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী—
আঁখিতারকার দেশে করিবারে বাস।
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি—
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।

১৮

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম।
মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন
তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম।
জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,
তব অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।
মম দুঃখবেদন মম সফল স্বপন
তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম।

১৮ কার্তিক ১৩০২

১৯

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি।
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি।

তুমি এসো হৃদে এসো, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর' বরিষন করুণ হাস্যভাতি।
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা—
আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যূথী জাতি।
তব পদতললীনা আমি বাজাব স্বর্ণবীণা—
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানসসাথি।

২৩ কার্তিক ১৩০২

২০

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না, না, না।'
যত বলি 'নাই রাতি— মলিন হয়েছে বাতি'
মুখপানে চেয়ে বলে, 'না, না, না।'
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা-হা ফুলের বনে।
আমি যত বলি 'তবে এবার যে যেতে হবে'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, 'না, না, না।'

২১

না বলে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে।
কাছে তার রই, তবুও ব্যথা যে রয় পরানে।
যে পথিক পথের ভুলে এল মোর প্রাণের কূলে,
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়— চলে যায় কোন্ উজানে।
এল যেই এল আমার আগল টুটে,
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে যে খেপা ওঠে জেগে,
সে কি আর সেই অবেলায় মিনতির বাধা মানে।

তোমার গোপন কথাটি সখি রেখোনা মনে।

শুধু আমায় শুধু আমায় বোলো আমায় গোপনে,

ওগো ধীর মধুর হাসিনী বোলো ধীর মধুর ভাষে

আমি কানে না শুনিব গো শুনিব প্রাণের শ্রবণে।

যবে গভীর যামিনী,

যবে নীরব মেদিনী,

যবে সুপ্তিমগন বিহগ-নীড়

কুসুমকাননে —

বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে

বোলো কম্পিত স্মিত হাসে,

বোলো মধুর-বেদন-বিধুর হৃদয়ে

শরম-নমিত নয়নে।

২২

তুমি যেয়ো না এখনি।
এখনো আছে রজনী।
পথ বিজন তিমিরসঘন,
কানন কণ্টকতরুগহন— আঁধারা ধরণী।
বড়ো সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা—
চিরদিনে, বঁধু, পাইনু হে তব দরশন।
আজি যাব অকূলের পারে,
ভাসাব প্রেমপারাবারে জীবনতরণী।

২৪ কার্তিক ১৩০২

২৩

যেতে দাও গেল যারা।
তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না—
আমার বাদলের গান হয় নি সারা।
কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার, নিভৃত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল— অধীর সমীর তন্দ্রাহারা।
দীপ নিবেছে নিবুক নাকো, আঁধারে তব পরশ রাখো।
বাজুক কাঁকন তোমার হাতে আমার গানের তালের সাথে,
যেমন নদীর ছলোছলো জলে
ঝরে ঝরোঝরো শ্রাবণধারা।

২৪

কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান।
চাহিলে মুখপানে, কী গাহিলে নীরবে
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান।

আমি শুনি দিবারজনী
তারি ধ্বনি, তারি প্রতিধ্বনি।
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান।

২৯ কার্তিক ১৩০২]

২৫

হৃদয়ের এ কূল, ও কূল, দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনি,
উথলে নয়নবারি।
যে দিকে চেয়ে দেখি, ওগো সখী,
কিছু আর চিনিতে না পারি।
পরানে পড়িয়াছে টান,
ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কী ঘোর তুফান সজনি গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি।
কেন এমন হল গো, আমার এই নবযৌবনে!
সহসা কী বহিল কোথাকার কোন্ পবনে!
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ—
জানি না কী বাসনা, কী বেদনা গো—
কেমনে আপনা নিবারি।

২৬

আমার মন মানে না— দিনরজনী।
আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি।
ওগো, কী ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়নবারি—
ওগো সজনি।
সে সুধাবচন, সে সুখপরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।

তাই শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে হৃদয় হয় উদাসী—
কেন না জানি।
ওগো, বাতাসে কী কথা ভেসে চলে আসে, আকাশে কী মুখ জাগে!
ওগো, বনমর্মরে নদীনির্ঝরে কী মধুর সুর লাগে!
ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে—
আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে
দিব নিছনি!

২৭

কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে।
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি—
তাকাই কেন পথের পানে!
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে বনের বাসে।
সকাল-সাঁঝে বাঁশি বাজে, বিকল করে সকল কাজে—
বাজায় কে যে কিসের তানে!

২৩ আষাঢ় ১৩১১

২৮

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে?
চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাও তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে।
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।

কী কুসুমবাসে ফাগুনবাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।
চল্ ওরে এই খ্যাপা বাতাসেই
সাথে নিয়ে সেই উদাসীরে।

২৯

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে!
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারা দিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে—
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে!

৩০

কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে, আর সময় নাহি রে।
বাতাস দিল দোল্, দিল দোল্;
ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল্, ও তুই খোল্।
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে।
আজ শুক্লা একাদশী, হেরো নিদ্রাহারা শশী
ওই স্বপ্নপারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।
তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই—
ও তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই—
সবার সাথে চলবি রাতে সামনে চাহি রে।

আষাঢ় ১৩১৮

৩১

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
ওগো, হৃদয়ে যবে মোহন রবে, বাজবে বাঁশি
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে, পরবে ফাঁসি—
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়।
আহা, আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিনবায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে—
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বুঝি পাগলপ্রায়।
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।

৩২

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে—
প্রেমকে আমার মালা ক'রে গলায় তোমার দোলাব।
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে জোয়ারে ঢেউ তোলাব।

৩৩

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে— ভালোবাসে আড়াল থেকে—
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায়।

৩৪

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়—
বড়ো উতলা আজ পরান আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে!
তুমি সাধ ক'রে, নাথ, ধরা দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয়।

৩৫

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।
ওগো আমায় প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়
পরো পরো পরো তবে।
মেঘ রঙে রঙে বোনা, আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ যে বাজল পাখির রবে।
আজ রঙ-সাগরে তুফান ওঠে মেতে।
যখন তারি হাওয়া লাগে তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।
সেই রাতের-স্বপন-ভাঙা আমার হৃদয় হোক-না রাঙা
তোমার রঙেরই গৌরবে।

৩৬

বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা অধীর অদর্শনতৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে!
সুদূরের সুগন্ধধারা বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা ঘুরে মরে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি সাথে সাথে।

অগ্রহায়ণ ১৩১৭

৩৭

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদলসাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
বনের ছায়ায় জলছলছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
খনে খনে ওই গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ বাজে।
কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির-আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা
গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে।

৩৮

উতল-ধারা বাদল ঝরে— সকল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে, পাগল নদী ওঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে, তমালবনে আঁধার করে।
ওগো বঁধু, দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে—
আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির-রাতি, জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরানখানি দেব পাতি— চরণ রেখো তাহার 'পরে।

ভুলে গিয়ে জীবন মরণ লব তোমায় ক'রে বরণ—
করিব জয় শরম-ত্রাসে, দাঁড়াব আজ তোমার পাশে—
বাঁধন বাধা যাবে জ্ব'লে, সুখ দুঃখ দেব দ'লে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে বাহির হব অভয়ভরে।

উতল-ধারা বাদল ঝরে, দুয়ার খুলে এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে, সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে— নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

৩৯

সবার সাথে চলতেছিল
অজানা এই পথের অন্ধকারে—
কোন্ সকালের হঠাৎ-আলোয়
পাশে আমার দেখতে পেলেম তারে।
এক নিমেষেই রাত্রি হল ভোর,
চিরদিনের ধন যেন সে মোর,
পরিচয়ের অন্ত যেন
কোনোখানে নাইকো একেবারে—
চেনা কুসুম ফুটে আছে
না-চেনা এই গহন বনের ধারে
অজানা এই পথের অন্ধকারে।

জানি জানি দিনের শেষে
সন্ধ্যাতিমির নামবে পথের মাঝে—
আবার কখন্ পড়বে আড়াল,
দেখাশোনার বাঁধন রবে না যে!
তখন আমি পাব মনে মনে
পরিচয়ের পরশ ক্ষণে ক্ষণে,
জানব চিরদিনের পথে
আঁধার-আলোয় চলছি সারে সারে—
হৃদয়-মাঝে দেখব খুঁজে
একটি মিলন সব-হারানোর পারে
অজানা এই পথের অন্ধকারে।

৪০

কাল   রাতের বেলা গান এল মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।
যে কথাটি বলব তোমায় ব'লে   কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে   উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে—
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।
ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে   পাখির গানে আকাশ গেল পূরে,
সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে   যতই প্রয়াস করি পরানপণে—
যখন তুমি আছ আমার সনে।

৪১

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো।
ভরা সে পাত্র তারে বুকে ক'রে
বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধ'রে—
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে প্রিয় হে প্রিয়!
বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস
নবীন উষার পুষ্পসুবাস—
এরই 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো।

১৩ পৌষ ১৩২১

৪২

জাগরণে যায় বিভাবরী—
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি   মরি মরি!

যার লাগি ফিরি একা একা— আঁখি পিপাসিত, নাহি দেখা,
তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি মরি মরি !
বাণী নাহি, তবু কানে কানে কী যে শুনি তাহা কেবা জানে।
এই হিয়াভরা বেদনাতে, বারি-ছলোছলো আঁখিপাতে,
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি মরি মরি !

৪৩

অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।
আকুল আঁচলে পথিকচরণে মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো—
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ, নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো।
এসো এসো বিনা ভূষণেই, দোষ নেই তাহে দোষ নেই।
যে আসে আসুক ওই তব রূপ অযতন-ছাঁদে ছাঁদিয়ো।
শুধু হাসিখানি আঁখিকোণে হানি উতলা হৃদয় ধাঁদিয়ো।

৪৪

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া।
অনেক দিনের বিদায়বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি—
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া।
কোন্ ফাগুনে যে ফুল ফোটা হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।
বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভ'রে ফিরে আসে সে গান-গাওয়া।

১৩২৮

৪৫

আমার মনের কোণের বাইরে
আমি জানলা খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাই রে।
কোন্ অনেক দূরে উদাস সুরে
আভাস যে কার পাই রে—
আছে-আছে নাই রে।
আমার দুই আঁখি হল হারা,
কোন্ গগনে খোঁজে কোন্ সন্ধ্যাতারা।
কার ছায়া আমায় ছুঁয়ে যে যায়,
কাঁপে হৃদয় তাই রে—
গুন্‌গুনিয়ে গাই রে।

শরৎ ১৩২৮

৪৬

আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে,
জেনো জেনো মন রয়েছে তোমায় লয়ে।
পথের ধারে আসন পাতি তোমায় দেবার মালা গাঁথি,
জেনো জেনো তাইতে আছি মগন হয়ে।
চলে গেল যাত্রী-সবে নানান পথে কলরবে—
আমার চলা এমনি ক'রে আপন হাতে সাজি ভ'রে
জেনো জেনো আপন-মনে গোপন রয়ে।

শরৎ ১৩২৮

৪৭

তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা, বয়ে যায় বেলা কেমন বিনা কারণে।
এই পাগল হাওয়া কী গান-গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি সুনীল গগনে।

সে গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমরগুঞ্জনে।
ওই আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া
এমন ক'রে লাগে আজি আমার নয়নে।

শরৎ ১৩২৮

৪৮

তার বিদায়বেলার মালাখানি আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে।
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে জাগে ফাগুন-সমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে।
দিনের শেষে যেতে যেতে পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনান্তরে।
সেই ছায়া এই আমার মনে, সেই ছায়া ওই কাঁপে বনে,
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে।

১৩ ফাল্গুন ১৩২৮

৪৯

ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে।
বাণী তার বুঝি না রে, ভরে মন বেদনাতে।
উদয়শৈলমূলে জীবনের কোন্ কূলে
এই বাণী জেগেছিল কবে কোন্ মধুরাতে।
মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে
বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পরপারে।
সমীরণে কোন্ মায়া ফিরিছে স্বপনকায়া,
বেণুবনে কাঁপে ছায়া অলখ-চরণ-পাতে।

১৫ ফাল্গুন ১৩২৮

৫০

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায়,
ঝুমকোলতার চিকন পাতা কাঁপে রে কার চম্‌কে-চাওয়ায়।
হারিয়ে-যাওয়া কার সে বাণী   কার সোহাগের স্মরণখানি
আমের বোলের গন্ধে মিশে
কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়।
কাঁকন-দুটির রিনিঝিনি কার বা এখন মনে আছে!
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি পিয়ালবনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ওই আভাস দোলে   নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে
তার সাথে মোর দেখা ছিল
সেই সেকালের তরী-বাওয়ায়।

১২ চৈত্র ১৩২৮

৫১

নিদ্রাহারা রাতের এ গান   বাঁধব আমি কেমন সুরে!
কোন্‌ রজনীগন্ধা হতে আনব সে তান কণ্ঠে পূরে।
সুরের কাঙাল আমার ব্যথা   ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা
সাঁঝ-সকালে বনের পথে   উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে।
ওগো, সে কোন্‌ বিহান বেলায়   এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম   শিউরেছিল শিশিরজলে।
অলকে তার একটি গুছি   করবীফুল রক্তরুচি,
নয়ন করে কী ফুল চয়ন   নীল গগনে দূরে দূরে!

১৩ চৈত্র ১৩২৮

৫২

আজি   মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে!
মম   পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে

থরথর কম্পন লাগিল রে।
কোন্ ভিখারী হায় রে এল আমারই এ অঙ্গনদ্বারে,
বুঝি সব মন ধন মম মাগিল রে।
হৃদয় বুঝি তারে জানে,
কুসুম ফোটায় তারই গানে।
আজি মম অন্তরমাঝে সেই পথিকেরই পদধ্বনি বাজে,
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙিল রে।

৫ ফাল্গুন ১৩২৯

৫৩

কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে,
হৃদয় মম থরোথরো কাঁপে তোমার গানে।
আজিকে এই প্রভাতবেলা মেঘের সাথে রোদের খেলা,
জলে নয়ন ভরোভরো চাহি তোমার পানে।
আলোর অধীর ঝিলিমিলি নদীর ঢেউয়ে ওঠে,
বনের হাসি খিলিখিলি পাতায় পাতায় ছোটে।
আকাশে ওই দেখি কী যে— -তোমার চোখের চাহনি যে।
সুনীল সুধা ঝরোঝরো ঝরে আমার প্রাণে।

৫৪

এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন সাঁঝের রঙে।
আমার সকল বাণী হল মগন সাঁঝের রঙে।
মনে লাগে দিনের পরে পথিক এবার আসবে ঘরে,
পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সাঁঝের রঙে।
অস্তাচলের সাগরকূলের এই বাতাসে
ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আমার তন্দ্রা আসে।
সন্ধ্যাযূথীর গন্ধ-সনে আসবে পথিক আপন-মনে—
আপনি হবে নিদ্রা-ভগন সাঁঝের রঙে।

৫৫

দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে।
সঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে।
মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে।
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে—
এসো এসো প্রাণে মম, গানে মম হে।
এসো নিবিড় মিলনক্ষণে রজনীগন্ধার কাননে,
স্বপন হয়ে এসো আমার নিশীথিনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে।

৫৬

ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঙিনায় বাজল গো, বাজল সে সুর আমার প্রাণের তালে-তালে।
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিন-হাওয়া দিশাহারা আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণে রঙের হিলোল—
মর্মরিত মর্ম গো,
মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে।

১৮ মাঘ ১৩২৯

৫৭

কে দেবে চাঁদ, তোমায় দোলা—
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল-ভোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায় দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়
বনে বনে দোল জাগালো ওই চাহনি তুফান-তোলা।

আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমলকানন দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে !
তোমার হাসির আভাস লেগে বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের কল্লোলিনী কলরোলা ।

১৮ মাঘ ১৩২৯

৫৮

যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে— জানি নে, জানি নে ।
সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে ।
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে !
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে !
ঘোমটা আমার নতুন পাতার হঠাৎ দোলা পাবে কি তার,
গোপন কথা নেবে জিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে ।

২৭ মাঘ ১৩২৯
সন্ধ্যা

৫৯

সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয় কাড়া !
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা, সে যে সৃষ্টিছাড়া ।
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী, পাতায় পাতায় কানাকানি-
'ওই এল যে' 'ওই এল যে' পরান দিল সাড়া ।
এই তো আমার আপনারই এই ফুল-ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভ'রে নানা রঙের সাজে ।

এই-যে পাখির গানে গানে   চরণধ্বনি বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে এই তো দিল নাড়া।

২২ মাঘ ১৩২৯
প্রভাত

৬০

আমার   মন চেয়ে রয় মনে মনে   হেরে মাধুরী।
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে   গুঞ্জরিল একতারা যে—
মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরি।
রূপের কোলে ওই-যে দোলে অরূপ মাধুরী।
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে   মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে!
হাতের ধরা ধরতে গেলে   ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে—
আপন-মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী।

৬১

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন   দিয়ে যাও, শেষে   দাও মুছে।
ওহে   চঞ্চল, বেলা   না যেতে খেলা   কেন তব যায় ঘুচে।
চকিত চোখের অশ্রুসজল   বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল—
কোথা সে পথের শেষ   কোন্ সুদূরের দেশ
সবাই তোমায় তাই পুছে।
বাঁশরির ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে,   ফুল যবে ফোটে নাই দেখা।
তোমার লগন যায় যে কখন,   মালা গেঁথে আমি রই একা।
'এসো এসো এসো' আঁখি কয় কেঁদে, তৃষিত বক্ষ বলে 'রাখি বেঁধে'—
যেতে যেতে, ওগো প্রিয়,   কিছু ফেলে রেখে দিয়ো
ধরা দিতে যদি নাই রুচে।

২৪ ফাল্গুন ১৩৩১

৬২

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে।
সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে—
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে।
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদল-হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে—
বৃষ্টিধারার ঝরোঝরে ঝাউবাগানের মরোমরে
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে।

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

৬৩

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে।
কেমন ক'রে যায় যে ডেকে, বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে ক্ষণে ক্ষণে।
বাঁধনহারা জলধারার কলরোলে
আমারে কোন্ পথের বাণী যায় যে ব'লে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে।

২ আষাঢ় ১৩২৯

৬৪

আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে
যার পায় নি দেখা তার উদ্দেশে।
বাঁধন ভোলে, হাওয়ায় দোলে, যায় সে বাদল-মেঘের কোলে রে
কোন্-সে অসম্ভবের দেশে।
সেথায় বিজন সাগরকূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে।

রাজার পুরে তমাল-গাছে   নূপুর শুনে ময়ূর নাচে   রে
সুদূর তেপান্তরের শেষে।

৬ আষাঢ় ১৩২৯

৬৫

আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
দিঘির কালো জলের 'পরে   মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ওই আকাশের সনে।
ম্লানস্মৃতির বাণী যত   পল্লবমর্মরের মতো
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।

১৪ আষাঢ় ১৩২৯

৬৬

পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা আজ   মরি মরি!
হৃদয়নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে   বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী।
ব্যথা আমার কূল মানে না,   বাধা মানে না।
পরান আমার ঘুম জানে না,   জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল পানে   তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে   আজ বিভাবরী।

৬৭

এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা।
কোন্ ভোলা দিনের বিরহিণী, যেন তারে চিনি চিনি—
ঘন বনের কোণে কোণে ফেরে ছায়ার-ঘোমটা-পরা।
কেন বিজন বাটের পানে তাকিয়ে আছি কে তা জানে!
হঠাৎ কখন অজানা সে আসবে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল-সাঁঝের আঁধার-মাঝে গান গাবে প্রাণ পাগল-করা।

৬৮

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজলনয়নে, যূথীমালা গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী, অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘনবরিষনে জলকলকলে এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

৬৯

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা!
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা!

৭০

সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।
কিসেরই পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না।
ঝরোঝরো নীরে, নিবিড় তিমিরে, সজল সমীরে গো
যেন কার বাণী কভু কানে আনে— কভু আনে না।

৭১

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্—
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল।
বাদল-হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদন আসে—
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল?
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপন-লোকে!
মন বসে রয় পথের ধারে, জানে না সে পাবে কারে—
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

৭২

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহারা রাতে?
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে—
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে।

৭৩

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।
শিউলিসুরভি রাতে বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মরগানে তব মর্মের বাণী বোলো।
বিষাদ-অশ্রুজলে মিলুক শরমহাসি—
মালতীবিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহ মিলনে গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো।

৭৪

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে!
ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণকলিকা।
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে—
হৃদয়কুঞ্জবনে মুঞ্জরিল মধুর শেফালিকা।

৭৫

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে।
হে অজানা, তোমায় তবে জেনেছিলেম অনুভবে—
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে।
তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে—
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে।

১৭ পৌষ ১৩৩০

৭৬

ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।
সেই সুরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।

সেই সুরে বাজে মনে অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলাদিনের কাঁদন-হাসি।

৭৭

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে কখন্ তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে—
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে ব'সে।
আজ এই চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্লরাতে সেই আলোকে দেখা হবে এক পলকে,
সব আবরণ যাবে যে খসে—
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

৭৮

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া, পাগল পরান চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
ও তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে।
আমার ভাবনা তো সব মিছে, আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও, তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে।

৭৯

এবার উজাড় করে লও হে আমার যা-কিছু সম্বল।
ফিরে চাও, ফিরে চাও, ফিরে চাও ওগো চঞ্চল!
চৈত্ররাতের বেলায় নাহয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপনস্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল।

যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে,
তবে ভাঙা খেলার ঘরে নাহয় দাঁড়াও ক্ষণেক তরে—
সেথা ধুলায় ধুলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল।

৩১ চৈত্র ১৩৩১

৮০

ও আমার ধ্যানেরই ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন।
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল, কুঞ্জে পূর্ণিমাচাঁদ হেসে আকুল—
তারা তোমায় খুঁজে না পায়,
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন।
আঁখিরে ফাঁকি দাও, একি ধারা!
অশ্রুজলে তারে কর সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা? পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা।
বেলা যে যায়, ফুল যে শুকায়—
অনাথ হয়ে আছে আমার ভুবন।

৮১

আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা,
কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা।
ফাগুনবেলায় বহে আনে আলোর কথা ছায়ার কানে,
তোমার মনে তারি সনে ভাবনা যত ফেরে যা-তা।
কাছে থেকে রইলে দূরে,
কান্না মিলায় গানের সুরে!
হারিয়ে-যাওয়া হৃদয় তব মূর্তি ধরে নব নব—
পিয়ালবনে উড়ালো চুল, বকুলবনে আঁচল পাতা।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

৮২

জানি হল যাবার আয়োজন—
তবু, পথিক, থামো কিছুক্ষণ।
শ্রাবণগগন বারি-ঝরা,
কাননবীথি ছায়ায় ভরা,
শুনি জলের ঝরোঝরে যূথীবনের ফুল-ঝরা ক্রন্দন।
যেয়ো— যখন বাদলশেষের পাখি
পথে পথে উঠবে ডাকি।
শিউলিবনে মধুর স্তবে
জাগবে শরৎলক্ষ্মী যবে,
শুভ্র আলোর শঙ্খরবে পরবে ভালে মঙ্গলচন্দন।

১ শ্রাবণ ১৩৩২

৮৩

যদি হল যাবার ক্ষণ
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন।
বারে বারে যেথায় আপন গানে স্বপন ভাসাই দূরের পানে
মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন—
সে মোর শূন্য বাতায়ন।
বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা
করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা!
ওরই ডালে আর শ্রাবণের পাখি স্মরণখানি আনবে না কি,
আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন—
আমাদের বিরহ মিলন!

৮৪

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি।
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি।

বিদায়লগনে ধরিয়া দুয়ার   তাই তো তোমায় বলি বারবার
'ফিরে এসো এসো বন্ধু আমার'—   বাষ্পবিভল বাণী!
যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস প্রিয়।
বনপথে যবে যাবে সে ক্ষণের   হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের,
তুলি লব সেই তব চরণের   দলিত কুসুমখানি।

২০ ফাল্গুন ১৩৩৩

৮৫

আমায়   থাকতে দে-না আপন-মনে।
সেই চরণের পরশখানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কথার পাকে কাজের ঘোরে   ভুলিয়ে রাখে কে আর মোরে!
তার স্মরণের বরণমালা গাঁথি বসে গোপন কোণে।
এই-যে ব্যথার রতনখানি   আমার বুকে দিল আনি
এই নিয়ে আজ দিনের শেষে   একা চলি তার উদ্দেশে—
নয়নজলে সামনে দাঁড়াই, তারে সাজাই তারি ধনে।

৮৬

এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে   এসো আমার ঘরে।
দুঃখসুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো।

ছিলে আশার অরূপ বাণী ফাগুনবাতাসে
বনের আকুল নিশ্বাসে—
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এসো বুকের 'পরে।

ফাল্গুন ১৩৩২

৮৭

আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে—
ওগো সাকী, দেবে না কি পেয়ালা মোর ভরে ভরে?
রসের ধারা সুধায় ছাঁকা
মৃগনাভির-আভাস-মাখা,
বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতায় মোরে।
মুখ তুলে চাও ওগো প্রিয়ে!
তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে
এক রজনীর মতো এবার— দাও-না আমায় অমর করে।
নন্দননিকুঞ্জশাখে
অনেক কুসুম ফুটে থাকে—
এমন মোহন রূপ দেখি নাই, গন্ধ এমন কোথায় ওরে।

ফাল্গুন ১৩৩২

৮৮

জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে।
আমি গোপন করিতে চাহি গো, ধরা পড়ে দুনয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চলে যাই কেবলই,
পথপাশে দিন বাহি গো—
তুমি দেখে যাও আঁখিকোণে কী আছে আমার মনে।
চির নিশীথতিমির গহনে আছে মোর পূজাবেদী—
চকিত হাসির দহনে সে তিমির দাও ভেদি।

বিজন দিবস-রাতিয়া
কাটে ধেয়ানের মালা গাঁথিয়া,
আনমনে গান গাহি গো—
তুমি শুনে যাও খনে খনে কী আছে আমার মনে।

১৬ ফাল্গুন ১৩৩২

৮৯

সেই ভালো সেই ভালো, আমারে নাহয় না জানো।
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে, কাছে কেন লাজে লাজানো।
মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর, বেণুবনছায়া হয়েছে মধুর—
থাক্‌-না এমনি গন্ধে-বিধুর মিলনকুঞ্জ সাজানো।
গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল নয়নে ভাবের খেলা।
উতল আঁচল, এলোথেলো চুল, দেখেছি ঝড়ের বেলা।
তোমাতে আমাতে হয় নি যে কথা মর্মে আমার আছে সে বারতা—
না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা আমার বাঁশিটি বাজানো।

চৈত্র ১৩৩২

৯০

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি—
আমার মন কয়, চিনি চিনি!
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে মাধবীবিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে— কলসে কঙ্কণে কিনিকিনি।
পারুল শুধাইল, কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামৃগ!
কামিনী ফুলকুল বরষিছে, পবন এলোচুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে— ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি।

চৈত্র ১৩৩২

৯১

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে।
তার দূরের বাণীর পরশমানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে।
শস্যখেতের গন্ধখানি একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থহাওয়া লাগুক আমার মুক্ত কেশে।
নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের উদাস বরন মেলুক আমার বাতায়নে।
সূর্য ডোবার রাঙা বেলায় ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন-মনে চোখের কোণে অশ্রু-আভাস উঠবে ভেসে।

চৈত্র ১৩৩২

৯২

কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন,
তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ।
হাসি যে তাই অশ্রুভারে নোওয়া,
ভাবনা যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,
ভাষায় যে তোর সুরের আবরণ।
তোর পরানে কোন্ পরশমণির খেলা,
তাই হৃদ্‌গগনে সোনার মেঘের মেলা।
দিনের স্রোতে তাই তো পলকগুলি
ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,
কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ।

ভাদ্র ১৩৩৩

৯৩

ওরে, কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে, তোর নয়ন এল জলে ভরে।
এত দিনে তোমায় বুঝি আঁধার ঘরে পেল খুঁজি—
পথের বঁধু দুয়ার ভেঙে পথের পথিক করবে তোরে।

তোর দুখের শিখায় জ্বাল্ রে প্রদীপ জ্বাল্ রে!
তোর সকল দিয়ে ভরিস পূজার থাল রে!
যেন জীবন মরণ একটি ধারায় তার চরণে আপনা হারায়,
সেই পরশে মোহের বাঁধন রূপ যেন পায় প্রেমের ডোরে।

৪ মাঘ ১৩৩৩

৯৪

কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা?
কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা?
নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত বিদায়বিষাদে উদাসমত—
ঘনকুন্তলভার ললাটে নত, ক্লান্ত তড়িতবধূ তন্দ্রাগতা।
কেশরকীর্ণ কদম্ববনে মর্মরমুখরিত মৃদুপবনে
বর্ষণহর্ষ-ভরা ধরণীর বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য মানো ওগো, ধৈর্য মানো! বরমাল্য গলে তব হয় নি ম্লান',
আজও হয় নি ম্লান'—
ফুলগন্ধনিবেদনবেদনসুন্দর মালতী তব চরণে প্রণতা।

১৪ ফাল্গুন ১৩৩৩

৯৫

ডাকিল মোরে জাগার সাথি।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে, প্রভাত হল আঁধার রাতি।
বাজায় বাঁশি তন্দ্রা-ভাঙা, ছড়ায় তারি বসন রাঙা—
ফুলের বাসে এই বাতাসে কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি।
গোপনতম অন্তরে কী লেখন-রেখা দিয়েছে লেখি!

মন তো তারি নাম জানে না, রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে রেখেছি তারি আসন পাতি।

জ্যৈষ্ঠ ? আষাঢ় ১৩৩৪]

৯৬

হায় রে, ওরে যায় না কি জানা ?
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা।
অলথ পথেই যাওয়া আসা, শুনি চরণধ্বনির ভাষা—
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা।
কেমন করে জানাই তারে
বসে আছি পথের ধারে ?
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা—
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা।

৯৭

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে,
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।
পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে।

৯৮

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না।

সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো— আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা।
যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহা লগনে।
এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার—
বাঁধিনু যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না।

১৩৩৪

৯৯

হায় অতিথি, এখনি কি হল তোমার যাবার বেলা ?
দেখো আমার হৃদয়তলে সারা রাতের আসন মেলা।
এসেছিলে দ্বিধাভরে
কিছু বুঝি চাবার তরে,
নীরব চোখে সন্ধ্যালোকে খেয়াল নিয়ে করলে খেলা।
জানালে না গানের ভাষায় এনেছিলে যে প্রত্যাশা।
শাখার আগায় বসল পাখি, ভুলে গেল বাঁধতে বাসা।
দেখা হল, হয় নি চেনা—
প্রশ্ন ছিল, শুধালে না—
আপন মনের আকাঙ্ক্ষারে আপনি কেন করলে হেলা!

৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

১০০

বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন-হাওয়ার স্রোতে—
পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে।
পলাশকলি দিকে দিকে তোমার আখর দিল লিখে,
চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে।
আকাশ-পারে পেতে আছে একলা আসনখানি—
নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী।

পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে   নবীন প্রাণের পত্র আসে—

পলাশ-জবায় কনক-চাঁপায় অশোকে অশ্বথে।

১০১

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে

দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।

এ কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে—

আছে সে নিখিলের মাধুরীরুচিতে।

এ কথা শিখানু যে আমার বীণারে,

গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে।

সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে

স্বপনফসলের বিছনে বিছনে।

মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,

কুসুমকুঞ্জে সে পবনে দুলিবে,

ঝরিবে শ্রাবণের বাদলসিচনে।

শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে

স্মরণবেদনার বরনে আঁকা সে—

চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে

ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে।

ফাল্গুন ১৩৩৬]

১০২

কখন দিলে পরায়ে   স্বপনে বরণমালা—

ব্যথার মালা!

প্রভাতে দেখি জেগে   অরুণ মেঘে

বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা।

গোপনে এসে গেলে,   দেখি নাই আঁখি মেলে।

আঁধারে দুঃখডোরে   বাঁধিলে মোরে,

ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা।

১০৩

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার করুণ রঙিন পথ !
এসেছে এসেছে অঙ্গনে মোর দুয়ারে লেগেছে রথ
সে যে সাগরপারের বাণী
মোর পরানে দিয়েছে আনি—
তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্য পর্বত।
দুঃখসুখের এপারে ওপারে দোলায় আমার মন—
কেন অকারণ অশ্রুসলিলে ভরে যায় দুনয়ন !
ওগো নিদারুণ পথ, জানি
জানি পুন নিয়ে যাবে টানি তারে—
চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া যাবে সে স্বপনবৎ।

১০৪

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু, বেঁধেছিনু অঞ্জলি।
তখনো কুহেলীজালে,
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা উঠিতেছে ছলোছলি।
এখনো বনের গান, বন্ধু, হয় নি তো অবসান—
তবু এখনি যাবে কি চলি ?
ও মোর করুণ বল্লিকা,
ও তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হল— এই বেলা তোর শেষ কথা দিস বলি

১০৫

তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো—
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে, মর্মরমুখরিত পবনে।

তুমি কিছু নিয়ে যাও   বেদনা হতে বেদনে—
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন,   যে বাণী নীরব নয়নে

১০৬

আমার   বনে বনে ধরল মুকুল,
বহে   মনে মনে দক্ষিণহাওয়া।
মৌমাছিদের ডানায় ডানায়
যেন   উড়ে মোর উৎসুক চাওয়া।
গোপন স্বপনকুসুমে কে   এমন   সুগভীর রঙ দিল এঁকে-
নব   কিশলয়শিহরনে   ভাবনা আমার হল ছাওয়া।
ফাল্গুনপূর্ণিমাতে
এই দিশাহারা রাতে
নিদ্রাবিহীন গানে   কোন্   নিরুদ্দেশের পানে
উদ্‌বেল গন্ধের জোয়ারতরঙ্গে   হবে মোর তরণী বাওয়া!

দোলপূর্ণিমা ১৩৪১

১০৭

এলেম নতুন দেশে—
তলায় গেল ভগ্ন তরী,   কূলে এলেম ভেসে।
অচিন মনের ভাষা   শোনাবে   অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে   রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল—
নতুন বেদনায়   ফিরব কেঁদে হেসে।
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া   হিয়ায় দেবে হিয়া।

যৌবনেরই নবোচ্ছ্বাসে ফাগুন মাসে
বাজবে নূপুর বনের ঘাসে।
মাতবে দখিনবায় মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়,
চঞ্চলিত এলো কেশে।

১০৮

বলো সখী, বলো তারি নাম আমার
কানে কানে
যে নাম বাজে তোমার প্রাণের বীণার
তানে তানে।
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায় সে নাম
মিলে যাবে
বিরহীবিহঙ্গকলগীতিকায়। সে নাম
মদির হবে যে বকুলঘ্রাণে।
নাহয় সখীদের মুখে মুখে
সে নাম দোলা খাবে সকৌতুকে।
পূর্ণিমারাতে একা যবে
অকারণে মন উতলা হবে সে নাম
শুনাইব গানে গানে।

১০৯

গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে।
না না না, রবে না গোপনে।
বিভল হাসিতে
বাজিল বাঁশিতে,
স্ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে।
না না না, রবে না গোপনে।

মধুপ গুঞ্জরিল,
মধুর বেদনায় আলোকপিয়াসি
অশোক মুঞ্জরিল।
হৃদয়শতদল
করিছে টলমল
অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে।
না না না, রবে না গোপনে।

১১০

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে।
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা,
কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দূর অরুণবিন্দুর— চরণরঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে।
সখীরে সাজাব সখার প্রেমে
অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে।
সাজাব সকরুণ বিরহবেদনায়,
সাজাব অক্ষয় মিলনসাধনায়—
মধুর লজ্জা রচিব সজ্জা যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে।

১১১

হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে তব নিশ্বাসপরশনে,
এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণসমীরণে।
কেন বঞ্চনা কর মোরে, কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে—
দেখা দাও, দেখা দাও, দেখা দাও দেহ মন ভ'রে মম নিকুঞ্জবনে।
দেখা দাও চম্পকে রঙ্গনে, দেখা দাও কিংশুকে কাঞ্চনে।
কেন শুধু বাঁশরির সুরে ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে?
যৌবন-উৎসবে ধরা দাও, ধরা দাও, ধরা দাও দৃষ্টির বন্ধনে।

১১২

না না,

ডাকব না, ডাকব না অমন ক'রে বাইরে থেকে।

পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে।

দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,

নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে—

এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে।

মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে—

গঙ্গাধারা মিশবে না কি কালো যমুনাতে ?

আপনি কী সুর উঠল বেজে— আপনা হতে এসেছে যে—

গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে।

১১৩

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,

দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি— পেয়েছি আঁধার রাতে।

না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো-

তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে।

তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল

বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে সে টলোমল।

মোর গানে গানে পলক পলকে ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,

শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে।

১১৪

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি ! আনন্দে বিষাদে মন উদাসী !

পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পূরে,

কী মাধুরীসুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি !

সহসা মনে জাগে আশা, মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।

আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে—

এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি।

১১৫

রোদনভরা এ বসন্ত, সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে।
কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা কার পথ চেয়ে জাগে।
দক্ষিণসমীরে দূর গগনে একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।
আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে ব্যাকুল কর হানি বারে বারে—
দেওয়া হল না যে আপনারে এই ব্যথা মনে লাগে।

১১৬

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে।
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে মোদের মিলিত নয়নে।
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা—
চিরজীবনেরই বাণীর বেদনা মিটিল দোঁহার নয়নে।

মাঘ ১৩৪২

১১৭

মায়াবনবিহারিণী হরিণী গহনস্বপনসঞ্চারিণী
কেন তারে ধরিবারে করি পণ অকারণ!
থাক্ থাক্ নিজমনে দূরেতে
আমি শুধু বাঁশরির সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন অকারণ।

চমকিবে ফাগুনের পবনে, পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে—
চিত্ত আকুল হবে অনুখন অকারণ।
দূর হতে আমি তারে সাধিব, গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব—
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন অকারণ।

আশ্বিন ১৩৪১

১১৮

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা
কোরো না হেলা হে গরবিনি!
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা,
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি হে গরবিনি!
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে, হায়
হেসে চলে যায় জোয়ার-জলে ভাসিয়ে ভেলা—
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি হে গরবিনি!
ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা
হে বিরহিণী!
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায় কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা দিনযামিনী
হে গরবিনি!

অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

১১৯

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জানো নাই তুমি জানো নাই
তুমি জানো নাই তার মূল্যের পরিমাণ।

রজনীগন্ধা অগোচরে যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে
তুমি জানো নাই তুমি জানো নাই
তুমি জানো নাই— মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।
বিদায় নেবার সময় এবার হল।
প্রসন্নমুখ তোলো, মুখ তোলো, মুখ তোলো—
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে।
যারে জানো নাই যারে জানো নাই
যারে জানো নাই
তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান।

১২০

তোমায় নতুন করে পাব ব'লেই হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন!
দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন
ও মোর ভালোবাসার ধন।
ওগো, তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের—
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন
ও মোর ভালোবাসার ধন!
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন—
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে—
ওই হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন
ও মোর ভালোবাসার ধন!

২০ ফাল্গুন ১৩২১। রাত্রি

১২১

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে।
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধারকেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া!
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে—
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে।

১২২

আজি বরিষন-মুখরিত শ্রাবণরাতি ;
স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি।
আজি কোন্ ভুলে ভুলি আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি,
মনে হয় বুঝি আসিছে সে মোর দুখরজনীর সাথি।
আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে তবু বৃথা আশ্বাসে
ধূলি-'পরে রাখিব রে মিলন-আসনখানি পাতি।

২১ শ্রাবণ ১৩৪২

১২৩

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে।
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ-নিবেদনের-গন্ধ-ঢালা—
লজ্জা দিয়ো না তারে।
সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে।
দূর হতে আমি দেখেছি তোমার ওই বাতায়নতলে নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে—
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে।

২২ শ্রাবণ ১৩৪২

১২৪

জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে।
তাই হোক তবে তাই হোক, দ্বার দিলেম খুলে।
এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে, মুখর নূপুর বাজে না চরণে,
তাই হোক তবে তাই হোক, এসো সহজ মনে।

ওই তো মালতী ঝরে পড়ে যায় মোর আঙিনায়,
শিথিল কবরী সাজাতে তোমার লও-না তুলে।
কোনো আয়োজন নাই একেবারে, সুর বাঁধা নাই এ বীণার তারে,
তাই হোক তবে, এসো হৃদয়ের মৌনপারে।
ঝরোঝরো বারি ঝরে বনমাঝে, আমার মনের সুর ওই বাজে—
উতলা হাওয়ার তালে তালে মন উঠিছে দুলে।

২৩ শ্রাবণ ১৩৪২

১২৫

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী।
রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনিরিনি।
দুরু দুরু করে হিয়া, মেঘ উঠে গরজিয়া,
ঝিল্লিঝনকে ঝিনিঝিনি।
মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা, গগনে নাহি শশীতারা।
বিজুলির চমকনে মিলে আলো ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে পথ ভোলে উদাসিনী।

১২৬

ওই মালতীলতা দোলে
পিয়ালতরুর কোলে পুব-হাওয়াতে।
মোর হৃদয়ে লাগে দোলা, ফিরি আপনভোলা—
মোর ভাবনা কোথায় হারা মেঘের মতন যায় চলে!
জানি নে কোথায় জাগো ওগো বন্ধু পরবাসী—
কোন্ নিভৃত বাতায়নে।
সেথা নিশীথের জল-ভরা কণ্ঠে
কোন্ বিরহিণীর বাণী তোমারে কী যায় ব'লে!

১২৭

আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো বকুলফুলের দুলে,
যেন মেঘরাগিণীরচিত কী সুর দুলালো কর্ণমূলে।
ওরা চলেছে কুঞ্জচ্ছায়াবীথিকায় হাস্যকল্লোল-উছল গীতিকায়
বেণুমর্মরমুখর পবনে তরঙ্গ তুলে।
আজি নীপশাখায়-শাখায় দুলিছে পুষ্পদোলা,
আজি কূলে কূলে তরল প্রলাপে যমুনা কলরোলা।
মেঘপুঞ্জ গরজে গুরু-গুরু, বনের বক্ষ কাঁপে দুরু-দুরু—
স্বপ্নলোকে পথ হারানু মনের ভুলে।

১২৮

গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা—
আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা।
হয়তো সে তুমি শোন নাই, সহজে বিদায় দিলে তাই—
আকাশ মুখর ছিল যে তখন, ঝরোঝরো বারিধারা।
চেয়েছিনু যবে মুখে তোলো নাই আঁখি—
আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি।
আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে—
জনমের মতো হায় হয়ে গেল হারা।

১২৯

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায় বুঝি তার খবর পেলে না!
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না!
প্রেমের বাদল নামল, তুমি জানো না হায় তাও কি?
আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি?

আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি, আমি সুরলোকের সুর সেধেছি,
তারি তানে তানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গলা গাও কি—
হায় আসরেতে বুঝি এলে না!
ডাক উঠেছে বারে বারে, তুমি সাড়া দাও কি?
আজ ঝুলনদিনে দোলন লাগে, তোমার পরান হেলে না!

১৩০

তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো বলো।
তোমার নয়ন কেন এমন ছলোছলো!
বনের 'পরে বৃষ্টি ঝরে ঝরোঝরো রবে,
সন্ধ্যা মুখরিত ঝিল্লিস্বরে নীপকুঞ্জতলে—
শালের বীথিকায় বারি বহে যায় কলোকলো।
আজি দিগন্তসীমা
বৃষ্টি-আড়ালে হারালো নীলিমা হারালো—
ছায়া পড়ে তোমার মুখের 'পরে,
ছায়া ঘনায় তব মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে,
অশ্রুমন্থর বাতাসে বাতাসে তোমার হৃদয় টলোটলো।

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৪৫]

১৩১

কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম,
রইনু চেয়ে না ব'লে।
দেখিলাম খোলা বাতায়নে মালা গাঁথো আপন-মনে,
গাও গুন্-গুন্ গুঞ্জরিয়া যূথীকুঁড়ি নিয়ে কোলে।
সারা আকাশ তোমার দিকে
চেয়ে ছিল অনিমিখে।
মেঘ-ছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল কালো কেশে,
বাদল-মেঘে মৃদুল হাওয়ায় অলক দোলে।

১৩২

আমার প্রিয়ার ছায়া
আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়!
বৃষ্টিসজল বিষণ্ন নিশ্বাসে, হায়!
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার আসে, হায়!
বারি-ঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশ-হারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়।
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে, হায়!

৮ ভাদ্র ১৩৪৫

১৩৩

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি।
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে,
লজ্জা আমার ঢাকিলে গো,
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে।
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে,
কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে,
এ নিরন্তর সংশয়ে হায় পারি নে যুঝিতে—
আমি তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে।

অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

১৩৪

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে!
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি—
লহো লহো করুণ করে।
যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে,
তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে
যেন আমায় স্মরণ করে।
বউকথাকও তন্দ্রাহারা বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সারা
আজি বিভোর রাতে।
দুজনের কানাকানি কথা দুজনের মিলনবিহ্বলতা,
জ্যোৎস্নাধারায় যায় ভেসে যায় দোলের পূর্ণিমাতে।
এই আভাসগুলি পড়বে মালায় গাঁথা কালকে দিনের তরে
তোমার অলস দ্বিপ্রহরে।

১৩৫

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—
তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে।
সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুলগন্ধ,
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ—
তুমি জান না, ঢেকে রেখেছি তোমার নাম
রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে।
তোমার অরূপ মূর্তিখানি
ফাল্গুনের আলোতে বসাই আনি।
বাঁশরি বাজাই ললিত-বসন্তে, সুদূর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে উন্মাদনে।

১৩৬

এসেছিলে তবু আস নাই   জানায়ে গেলে
সমুখের পথ দিয়ে   পলাতকা ছায়া ফেলে।
তোমার সে উদাসীনতা   সত্য কিনা জানি না সে,
চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে   বেদনা মেলে।
তখন   পাতায় পাতায়   বিন্দু বিন্দু ঝরে জল,
শ্যামল বনান্তভূমি   করে ছলোছল্।
তুমি চলে গেছ ধীরে ধীরে   সিক্ত সমীরে,
পিছনে   নীপবীথিকায় রৌদ্রছায়া যায় খেলে।

১৩৭

যবে   রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা—
মন যে কেমন করে,   হল দিশাহারা।
যেন কে গিয়েছে ডেকে,
রজনীতে সে কে   দ্বারে দিল নাড়া—
যবে   রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা।
বঁধু, দয়া করো,   আলোখানি ধরো হৃদয়ে।
আধো-জাগরিত তন্দ্রার ঘোরে
আঁখি জলে যায় যে ভ'রে।
স্বপনের তলে   ছায়াখানি দেখে
মনে মনে ভাবি   এসেছিল সে কে—
যবে   রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা।

ভাদ্র ১৩৪৬

স্ফুলিঙ্গ

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।

আষাঢ় ১৩৩৫

২

আমার প্রেম রবিকিরণ-হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে
তোমারে ঘেরে যেন।

৩

আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে
ধরণী কুসুমে দেয় ফিরে।

৪

আমি জানি মোর
ফুলগুলি ফুটে হরষে
না-জানা সে কোন্
শুভচুম্বন-পরশে।

৫

দুঃখেরে যখন প্রেম
করে শিরোমণি
তাহারে আনন্দ ব'লে
চিনি তো তখনি।

৬

পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরী—
দিন বৃথা গেল প্রিয়া!
তবুও তোমার ক্ষমা হাসি বহি
দেখা দিল আজেলিয়া।

৭

ফেলে যবে যাও একা থুয়ে
আকাশের নীলিমায়
কার ছোঁওয়া যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে—
বনে বনে বাতাসে বাতাসে
চলার আভাস কার
শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে!

৮

বহ্নি যবে বাঁধা থাকে
তরুর মর্মের মাঝখানে,
ফলে ফুলে পল্লবে বিরাজে।
যখন উদ্দাম শিখা
লজ্জাহীনা বন্ধন না মানে
ম'রে যায় ব্যর্থভস্মমাঝে।

৯

মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে—
চাঁদের কেমন ভাষা !
কোনো কথা নাই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা !

১০

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালোবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে।

১১

শিশিরসিক্ত বনমর্মর
ব্যাকুল করিল কেন
ভোরের স্বপনে অনামা প্রিয়ার
কানে কানে কথা যেন।

১২

সমস্ত-আকাশ-ভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশির-মাঝে খোঁজে নিজ সীমা।

১৩

হে প্রেম, যখন ক্ষমা করো তুমি
সব অভিমান ত্যেজে
কঠিন শাস্তি সে যে।
হে মাধুরী, তুমি কঠিন আঘাতে
যখন নীরব রহো,
সেই বড়ো দুঃসহ।

১৪

তুমি যে তুমিই, ওগো,
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

স্বীকৃতি

রাখীর প্রকাশসৌষ্ঠবে ও চিত্রবিভূষণে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের পরামর্শ ও প্রযত্ন উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের আঙ্গিক সৌষ্ঠব সম্পর্কে শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিকও নানা পরামর্শ দিয়াছেন। নির্দোষ মুদ্রণ-পারিপাট্যের বিষয়ে সর্বদা সচেষ্ট ও মনোযোগী ছিলেন শ্রীমানবেন্দ্র পাল এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী।

রাখীতে ব্যবহৃত অধিকাংশ চিত্র ও লেখাঙ্কন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে সংরক্ষিত। শিল্পীগুরু নন্দলালের আঁকা 'প্রত্যাগত' ছবিটি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের সংগ্রহে এবং তাঁহারই সৌজন্যে এই গ্রন্থে উহার প্রতিচ্ছবির ব্যবহার।

গ্রন্থমুদ্রণ-ব্যাপারে অভ্যস্ত দক্ষতা ও তৎপরতা দেখাইয়াছেন তাপসী প্রেস। চিত্রের ব্লক ও মুদ্রণে বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন রিপ্রোডাক্‌শন সিণ্ডিকেট, প্রসেস সিণ্ডিকেট এবং কিং হাফটোন কোম্পানি; সহায়তা করিয়াছেন শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য।

রাখী সংকলন ও মুদ্রণ অতি অল্পসময়ে সমাধা করিতে হইয়াছে; বর্তমান বিদ্যুৎসংকট সম্পর্কে বলিবার কিছু নাই— এ অবস্থায় যৎসামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি কোথাও থাকিলে ভবিষ্যতে সংশোধিত হইতে পারিবে।

সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩২	১০	স্বপ্নর্মত	স্বপ্নমত
১৩২	১৪	দিলেন	দিলেম
২৩২	১৫	ভালোবাসা।	ভালোবাসা।'
২৪৫	৮	অঙ্গবিহারিণী	অঙ্কবিহারিণী
২৭৩	১০	যোয়ো না—	যেয়ো না—
৩০৩	১০	ঝড়ে-পড়া	ঝ'রে পড়া
৩০৪	১	আমর্রি	আমারি
৩০৯	১২	চরণরঞ্জিব	চরণ রঞ্জিব

কদাচিৎ যথাস্থানে যথোচিত বিরামচিহ্ন নাই, কোনো হরপ বিপর্যস্ত বা কোনো অতিপর্বিক পদ ঠিকভাবে সাজানো হয় নাই— সুধীজন সহজেই এগুলির সংশোধন করিবেন।

ছত্র = ছন্দোবদ্ধ কবিতা-ছত্র

প্রথম ছত্রের সূচী